দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

রথযাত্রা হলো জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন
— পৃঃ ৩৩

৭৮ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা।। ১৩ জুলাই, ২০২৬।। ২৮ আষাঢ়, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

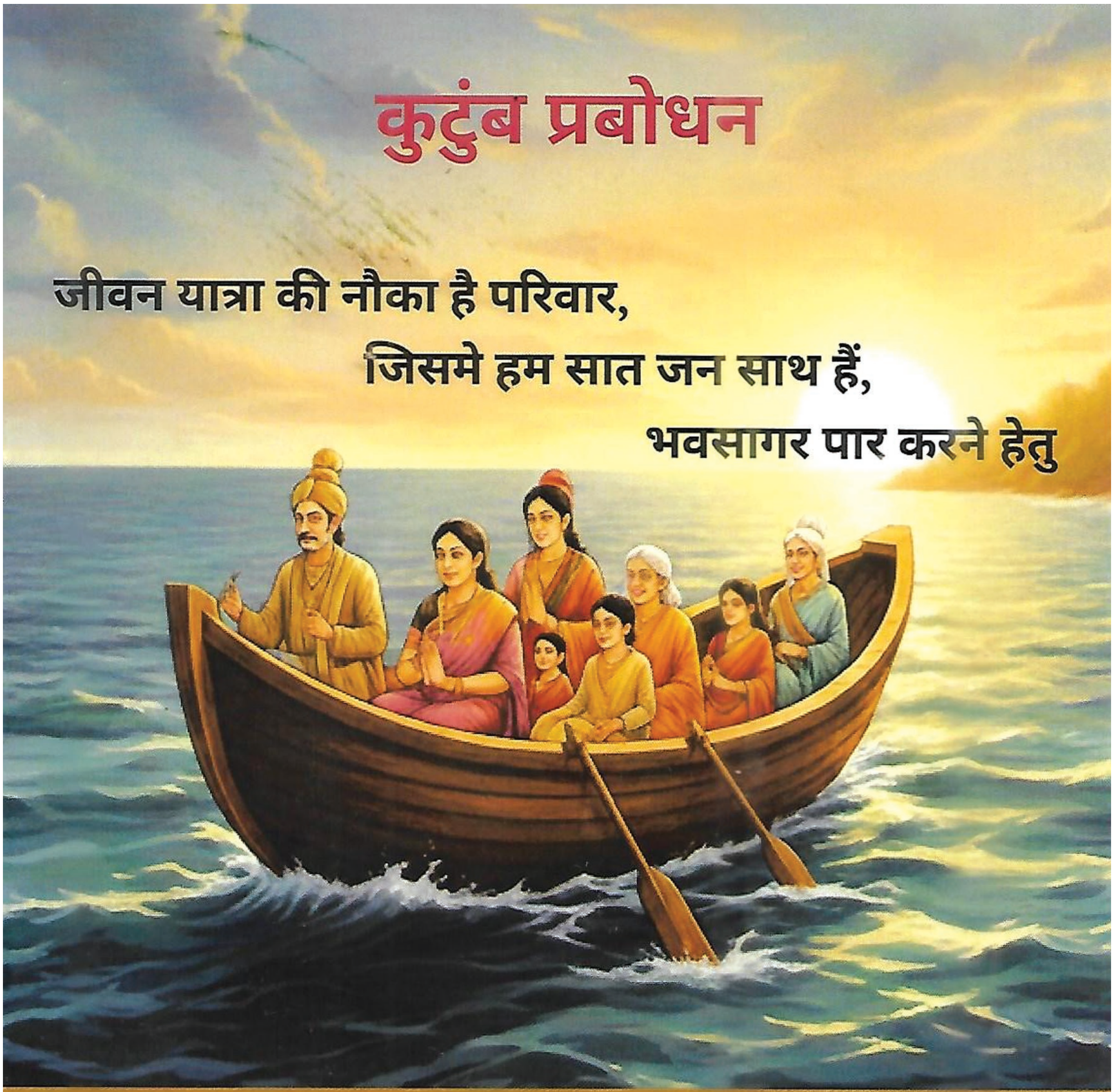

लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, ২৮ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

১৩ জুলাই - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

বিজেপিকে 'ব্যতিক্রমী দল'-এর ধারাবাহিকতা নিয়ে এগোতেই হবে : এই বাগানে ফুল তোলা মানা

◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

দিদির চুরি বন্ধ : রাজ্যে উন্নয়নের গন্ধ

◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

ভগবান বীরসা মুণ্ডার জন্মজয়ন্তীতে দিল্লির লালকেল্লায় জনজাতি সমাজের ন্যায্য দাবি ◻ রক্তিম পাতর ◻ ৮

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে চলেছে 'স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ'

◻ কৌটিল্য ◻ ১০

পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা বন্ধ থাকার পর্ব ভারতের ইতিহাসের অজ্ঞাত অধ্যায় ◻ দীপল বিশ্বাস ◻ ১১

বাংলাদেশি জেহাদিদের সীমাহীন আস্ফালন : ভারতের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ

◻ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ◻ ১৫

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ পর্যটনের রূপরেখা : সম্ভাবনা, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ দিশা ◻ ড. নীলাঞ্জন রায় ◻ ১৭

মহাপ্রভু জগন্নাথের মহাপ্রসাদ ◻ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল ◻ ৩১

রথযাত্রা হলো জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন

◻ প্রদীপ মারিক ◻ ৩৩

মার্বেল প্যালেসের ঐতিহ্যমণ্ডিত রথযাত্রা

◻ সপ্তর্ষি ঘোষ ◻ ৩৫

নৈহাটি কাঁঠালপাড়ার ঐতিহ্যমণ্ডিত রথযাত্রা

◻ বৈশাখী কুণ্ডু ◻ ৩৬

রথযাত্রা—দেশে ও বিদেশে ◻ শুভদীপ পাল ◻ ৩৭

শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

◻ গোপাল চক্রবর্তী ◻ ৪৩

লাঞ্ছিত বিবেকানন্দ ◻ সৈকত নিয়োগী ◻ ৪৭

গল্প কথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

প্রকাশিত হবে
২০ জুলাই
২০২৬

স্বস্তিকা

গুন্ডাদমন আইন

প্রকাশিত হবে
২০ জুলাই
২০২৬

বিগত সরকারের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গে খুন-জখম, লুঠতরাজ, তোলাবাজি, প্রমোটার-রাজ, পুলিশের ওপর আক্রমণ, সরকারি বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা রোজদিনই ঘটেছে। সব দেখেও রাজ্য সরকার কড়া হাতে দোষীদের দমন করতে এগিয়ে আসেনি। তাই রাজ্যটি হয়ে উঠেছে দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য। বর্তমান সরকার রাজ্যে আইনের শাসন ফেরাতে এবং সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে বিধানসভায় গুন্ডাদমন বিল পাশ করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই এই বিল আইনের রূপ নেবে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে উনআশি বর্ষ পূর্ণ করতে চলেছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সাম্য ও সম্প্রীতির উৎসব—রথযাত্রা

পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আবির্ভাবের ইতিহাস অতি প্রাচীন। শাস্ত্রগ্রন্থ অনুসারে, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবান বিষ্ণুর নীলমাধব রূপের সন্ধান পাইয়াছিলেন। শ্রীভগবানের স্বপ্নাদেশে সমুদ্রে ভেসে আসা কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা স্বয়ং দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার বিগ্রহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে যে শ্রীমন্দির রহিয়াছে তাহা দ্বাদশ শতাব্দীতে পূর্ব গঙ্গরাজবংশের রাজা অনঙ্গবর্মন চোড়গঙ্গদেব নির্মাণকার্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরের বিগ্রহগুলি নিমকাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত। ইহারও এক শাস্ত্রীয় কাহিনি রহিয়াছে। প্রতি দ্বাদশবর্ষ অন্তর পুরাতন বিগ্রহ পরিবর্তন করিয়া এক ভব্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নূতন বিগ্রহ স্থাপন করা হইয়া থাকে। ইহা 'নবকলেবর' নামে অভিহিত। শুধু উৎকলবাসী নহে, সমগ্র ভারতের আপামর জনগণ শ্রীমন্দির এবং বিগ্রহত্রয়কে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। প্রভু জগন্নাথদেবকে হিন্দুদিগের কোনো একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বলিয়া মনে করা হয় না। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, স্মার্ত, গাণপত্য সমস্ত শাখারই মানুষ প্রভু জগন্নাথদেবকে পরম ব্রহ্ম মনে করিয়া থাকেন। এমনকী বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের অনুগামীগণও তাঁহাকে পরম ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ওড়িশার ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে প্রভু জগন্নাথদেব প্রথমাবস্থায় মূলত জনজাতি জনগোষ্ঠীর লোকেদের দ্বারা পূজিত হইতেন। ওড়িশার আদিম জনজাতি শবর জনগোষ্ঠীর মানুষেরা প্রকৃতিপূজক। তাঁহারা বৃক্ষকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাহাদিগের ঈশ্বরকে 'জগনাথ' বলিতেন। সম্ভবত এই 'জগনাথ' শব্দ হইতেই সংস্কৃত জগন্নাথ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। যদিও ইহা সর্বসম্মত ধারণা নহে। তথাপি কাষ্ঠনির্মিত শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহকে দারুব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহে শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত অবতারের চিহ্ন রহিয়াছে, তাই বিশেষ বিশেষ তিথিতে জগন্নাথ বিগ্রহকে শ্রীবিষ্ণুর এক-একটি অবতার হিসাবে পূজা করা হইয়া থাকে। পুরীতে রথযাত্রার প্রচলন মূলত জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার বাৎসরিক গুণ্ডিচা মন্দির পরিদর্শনের শাস্ত্রীয় কাহিনিকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইতেছে। মন্দিরের প্রাচীন পুঁথি 'মাদলা পঞ্জী' অনুসারে দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের শাসনকালে মতান্তরে সোমবংশীয় রাজাদিগের শাসনকালে পূর্ণাঙ্গ রথযাত্রার প্রচলন হইয়াছে।

বঙ্গদেশে রথযাত্রার প্রচলন মূলত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচল গমনের পর হইতেই শুরু হইয়াছে। দুর্গাপূজার পরেই বাঙ্গালির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অনুষ্ঠান এই রথযাত্রা। বঙ্গদেশের প্রাচীনতম এবং ভারতবর্ষের দ্বিতীয় প্রাচীনতম রথযাত্রা হইল হুগলী জেলার মাহেশের রথযাত্রা। এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মেলাকে পটভূমি করিয়া সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'রাধারাণী' উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিতেন। তিনি শ্রীমন্দিরের গরুড়স্তম্ভের পশ্চাৎভাগ হইতে ব্যাকুল নয়নে জগন্নাথবিগ্রহ দর্শন করিতেন। তাঁহার ভক্তি ও নামসংকীর্তনে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা এক নূতন মাত্রা লাভ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ ও ভক্তগণের প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশের সর্বত্র রথযাত্রার প্রচলন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের গুপ্তিপাড়া, মহিষাদল, আমাদপুরের ন্যায় বিভিন্ন স্থানে ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রার আয়োজন হইয়া থাকে। ভারতবাসীর নিকট রথযাত্রা শুধু একটি উৎসব নহে, এটি মানবজীবনের আত্মীক যাত্রারও প্রতীক। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, রথ হইল মানব শরীর, রথের সারথী হইল বিবেক বা আত্মা এবং রাশ হইল মানব মন। মানবশরীরে যেইরূপ দুইশত ছয়টি অস্থি, দশ ইন্দ্রিয় এবং ষড়রিপু রহিয়াছে, তদ্রূপ পুরীধামের জগন্নাথ রথও দুইশত ছয়টি কাষ্ঠখণ্ড এবং ষোলোটি চক্র দ্বারা গঠিত। ভক্তদিগের বিশ্বাস, রথযাত্রায় শ্রীভগবান ও ভক্তের মিলন ঘটিয়া থাকে। এইদিন শ্রীভগবান তাঁহার মন্দির হইতে ভক্তের মাঝে পথে নামিয়া আসেন। রথযাত্রায় প্রেম, একতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গম ঘটিয়া থাকে। রথযাত্রার এই সাম্য ও সম্প্রীতির বার্তায় বিশ্ববাসী হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহার কারণেই রথযাত্রার বিশ্বায়ন ঘটিয়াছে।

সুভাষিতম্

ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্ ভাবো হি কারণম্।।

অর্থ ঃ দেবতা কাঠে, পাথরে কিংবা মাটির মূর্তির মধ্যে থাকেন না; দেবতা কেবল ভক্তির মধ্যে বিরাজমান থাকেন। তাই ভক্তিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বিজেপিকে 'ব্যতিক্রমী দল'-এর ধারাবাহিকতা নিয়ে এগোতেই হবে

এই বাগানে ফুল তোলা মানা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

পাঠক জানেন যে ২০২১ সালের আগস্ট মাস থেকে রাজ্যপাট কীভাবে এ রাজ্যের সব সম্প্রদায় আর শ্রেণীর মানুষকে প্রধানভাবে হিন্দুদের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে বলেছিল। বিশেষভাবে বলা হতো হাজরা আর কালীঘাট অঞ্চলের একটি পারিবারিক ক্লাবের হাতে রাজ্যের মানুষ তাদের ভবিষ্যৎ তুলে দিয়ে কী ভুল করেছিল। কীভাবে তাদের ধীরে ধীরে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল। ৪ মে সে অন্ধকার কেটে আলো ফুটে বেরিয়েছে। ক্লাবের তস্কররা জেলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। অনেকে আবার ভাঙা নৌকা থেকে ইঁদুরের মতো অন্যত্র লাফিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে। কোনো ইঁদুরকে যেন ছাড় দেওয়া না হয়। সে ধেড়ে বা কচি হোক। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী তা বুঝিয়েছেন তাই তাঁকে সাধুবাদ। তবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন যে দুরাত্মারা নতুন ছল করে আবার ফিরবে। এরাজ্যের প্রধানতম দুরাত্মা অবশেষে একমাস বাদে হার স্বীকার শুভেন্দুবাবুকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এক মাসের ভ্রম কাটিয়ে উঠে তিনি বুঝেছেন অদূর ভবিষ্যতে তার আর নতুন করে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আশা নেই। তাই আমতা আমতা করে ভবিষ্যতের কথা বলেছেন।

১৯৭৭ সালের অত্যাচারী আর অবিচারি বিদেশি বাম জমানার উত্তরসূরী হিসেবেই পনেরো বছর ধরে তস্করের দলকে থাকতে দিয়ে ভুল করেছিল রাজ্যের মানুষ। সাত দশকের আগাছা আর বিষাক্ত গাছ কেটে তাই নতুন উদ্যান তৈরি করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য রাখতে হবে তাতে কোনো বিষবৃক্ষ যেন ভুল করেও পোঁতা না হয়। তা হলে পড়বে এক ফোঁটা চোনা। তাতে দুধ নষ্ট হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে রাজ্যের মানুষকে এটাও বোঝাতে হবে এ রাজ্যের নতুন উদ্যানে ফুল তোলা সহজ হবে না। সাত দশক ধরে এই রাজ্যে যে রাজনৈতিক আর প্রশাসনিক পরম্পরা চলেছিল এবার তাকে বিদায় জানাতে হবে। পাশ্চাত্যবাদী, বিদেশি ভাবধারা আর লুম্পেন, সংস্কৃতির যে সমাহার এখানে হয়েছিল তাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। একমাত্র ব্যতিক্রমী আর আপোশহীন দল হিসেবে বিজেপিকে সে ধারা তৈরি করতে হবে। ব্যতিক্রম শব্দটির ভেতরেই ধারাবাহিকতার চিহ্ন রয়েছে। আগামী কয়েক দশকে তা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু হোমল্যান্ডের পরিচ্ছন্ন প্রশাসনিক ভাবনাকে সামনে রেখেই তা করতে হবে।

বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা দেশ বিরোধীরা গলা মিলিয়ে গেল গেল রব তুলেছে। তাদের অধিকাংশ হলো জেহাদি মোল্লাবাদীদের কর্তাভজা। মোল্লাতোষণ তাদের কাছে যত প্রেয় তার থেকে অনেক বেশি প্রেয় দেশ আর বিজেপি বিরোধিতা। মোল্লাবাদী বুদ্ধিজীবীদের নাড়ি কাটা হয়েছিল মোল্লা জল্লাদদের সূতিকাগৃহে। তাদের মূল কথা, ভোটারকে ভোট না দিতে দিয়ে ঘুরপথে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। মূর্খের দল প্রবাদটি জানে না 'মাছেরা যদি ঘোড়া হতো'— 'ইফ ফিশেস ওয়্যার হর্সেস' তাহলে তারাই ক্ষমতায় আসত। দেশ বিরোধিতা করার জন্য তৈরি হওয়া 'দেশ বাঁচাও মঞ্চ'কে তাই অবিলম্বে বেআইনি ঘোষণা করা উচিত। তাদের ভিটেমাটি চাটি করতে হবে। রাস্তা আর বাজার জুড়ে মঞ্চ খাটিয়ে তারা যে দেশবিরোধী আর কুৎসা প্রচার এখনো চালিয়ে যাচ্ছে তা এখনি বন্ধ করা উচিত। এরা ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, জাতীয়তাবোধের কট্টর বিরোধী, তাই এদের সব অনুমতি বন্ধ করা উচিত।

আধিপত্যবাদের মিথ্যা ধুয়ো তুলে এরা দেশ বিরোধিতার ব্যবসা করে। জেহাদি 'ডগ স্কোয়াডের' কয়েকজন অন্তর্ধান করেছে। লজ্জার মাথা খেয়ে কয়েকজন তেল-সাবান বিক্রি নিয়ে সান্ধ্য আলোচনা করছে। বিদেশি ভাবনায় সঞ্জাত গণতন্ত্রের পশ্চিমি ব্যাখ্যার সর্বস্তর মেনে নিয়েও বলা চলে এই কীটসর্বস্বদের এক কোণে ঠেসে দেওয়া উচিত। তারা ভারতীয় হিসেবে নিজেদের মানতে নারাজ। ভারত সংস্কৃতির তিনটি ধারা— সম্মেলন বা (অ্যাসিমিলিশেন), গ্রহণ বা (অ্যাডপশন) এবং প্রশংসা বা মহিমান্বিতকরণ (গ্লরিফিকেশন) তারা মানে না। তারা ভারতের নাগরিক বা অধিবাসী হওয়ার অযোগ্য। এদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবেই দেখা উচিত। যদিও সংবিধান আর কার্যক্ষেত্রে তা অসম্ভব। পুরোনো সরকারের পদলেহন করে তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে চোখ বুজে ছিল। বর্তমান সরকার যেন তেমন কাউকে রেয়াত না করে। ব্যক্তিগত পরিচয়ের পরিসরে সামাজিক কর্তব্য আর কর্তৃত্বের রাষ্ট্রধর্মীয় বোধ যেন হারিয়ে না যায়। যে দুর্নীতি বিরোধী মন্ত্রীগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে তারা ১৫ বছরের তস্করদের খেরোর খাতা বের করবেন। ওরা ইতিহাসকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল। বাঙ্গালি আর হিন্দু জাতিকে করতে চেয়েছিল অপমান। বিজেপিকে তাই ব্যতিক্রমী দল হিসেবে এই বিষফলকে নির্মূল করতে হবে। রাজ্যের বাতাসকে করতে হবে বিষমুক্ত।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

দিদির চুরি বন্ধ রাজ্যে উন্নয়নের গন্ধ

অভাবিনী দিদি,

এখন আপনার সবতেই অভাব। এমনকী পাশে বসে থাকার মতো ভাই-বোনেরও অভাব। তবে একটু অতীতের কথা বলি। রাজ্যের মানুষ আপনাকে বহিষ্কার করার আগের কথা। তখন আপনি মুখ্যমন্ত্রী। তখন আপনি সততার প্রতীক।

ইদানীং দেখছি, নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজেকে যেন কল্পতরু মনে করছেন। এটা করব, ওটা করব রোজ নতুন নতুন ঘোষণা। কিন্তু এত টাকা শুভেন্দু অধিকারী পাবেন কোথায়!

রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের সাত বছরের বকেয়া পেনশন মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বকেয়া পেনশনের এরিয়ারের টাকা মেটাবে সরকার। এখনই মিটিয়ে দেওয়া হবে বকেয়ার ৫০ শতাংশ। বাকি ৫০ শতাংশ টাকাও ধাপে ধাপে মেটাবে সরকার। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের বাজেটে সরকারি কর্মীদের ২০ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয়। ফলে ডিএ-র পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮ শতাংশ। কিন্তু এতেই তো সব হবে না দিদি।

স্থায়ী সমাধানের জন্য কর্মসংস্থানের হাল ফেরাতে এবং রাজ্যের উন্নতির জন্য বড়ো শিল্প ছাড়া বিকল্প নেই। মনে রাখতে হবে, বড়ো শিল্পের হাত ধরে আসবে ছোটো-মাঝারি শিল্পও। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের পরে রেল থেকে বন্দর-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা লগ্নি করতে চাইছে বা করছে। আইওসি-র বিনিয়োগও তারই অঙ্গ। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসেই ডানকুনিতে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা লগ্নিতে একটি হোসিয়ারি পার্ক চালু করা হতে পারে। পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ এই শিল্প প্রকল্পে কয়েক হাজার কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। হলদিয়া শোধনাগারে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েলের (আইওসি) দু'টি প্রকল্প চূড়ান্ত ছাড়পত্র পাওয়ার জায়গায় পৌঁছেছে। একটি প্রপিলিন রিকভারি ইউনিট, অন্যটি ডিএএস। সেখানেই প্রাথমিক ভাবে ৬৫০ কোটি টাকা লগ্নি করছে সংস্থাটি।

এছাড়াও যে বার্তা মিলেছে তাতে রাজ্যে টাটা আসবে, বিড়লারা আসবে। আদিত্য বিড়লাকে বাম আমলে হেনস্থা করা হয়েছিল। সূত্র জানাচ্ছে, শীঘ্রই আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর কর্ণধার কুমার মঙ্গলম বিড়লা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন। বহুকাল আগেই এই রাজ্যকে ধনী করতে অশোকনগরে তেল, বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় বিরল খনিজ, বাঁকুড়া-কালিম্পঙে সোনা, রানাঘাটে প্রাকৃতিক গ্যাস মিলেছে। এগুলি রাজ্যের শিল্পায়নকে এগিয়ে দেবে।

কিন্তু দিদি আপনি চিরকাল খালি অভাবের কথা বলে এসেছেন। কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। রাজ্যের অনেক দেনা। আয় বাড়াতে পারেননি। অভাবের সংসারে ঋণের পর ঋণ নিয়ে গেছেন। কিন্তু আপনি সততার আড়ালে চুরিতে প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন দিনের পর দিন। সে টাকা কোথায় গেছে কেউ জানে না। আপনি আর আমি জানি। আসলে দিদি অপত্য স্নেহ বড়ো বিষম বস্তু। ভাইপোকে ধনী করতে আপনি কোনো কসুর করেননি। ভারতের হয় তো বিশ্বেরও ইতিহাসে আপনার মতো পিসি খুঁজে পাওয়া যাবে না। বলেই দিই সেই কাহিনি।

সরকারি তথ্য বলছে, ২০২০ সালের আগে বীরভূমের পাথর থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যেমন ২০২০-২১ অর্থবর্ষে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৯ কোটি টাকা করে রাজস্ব পেয়েছিল নবান্ন। অর্থাৎ গোটা বছরে সেই পরিমাণ প্রায় ১০৮ কোটি। ২০২১-২২ আর্থিক বছরে তা বেড়ে হয় প্রায় ১২০ কোটি (মাসে গড়ে ১০ কোটি টাকা প্রায়) টাকায়। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে রাজস্ব আদায় হয় ২৬৪ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সেই পরিমাণ কমে হয় ১৪৪ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ বছরে তা আরও কমে হয় প্রায় ১৩২ কোটি টাকা। কিন্তু এ বছর মাত্র এক মাসেই (মে-র মাঝামাঝি থেকে জুনের মাঝামাঝি) প্রধানত ওই জেলার পাথর থেকে রাজ্যের রাজস্ব আদায় হয়েছে প্রায় ৭৩ কোটি টাকা। অন্য আরও ক'টি কর ধরলে তা প্রায় ৮৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে শুধু একটি জেলা থেকেই বছরে কম-বেশি ৯০০ কোটি টাকা আয় করতে পারে রাজ্য।

পাশাপাশি, গত বছরের গোটা সময়ে পূর্ব বর্ধমান জেলায় বালির অবৈধ মজুতের উপর জরিমানা চাপিয়ে সরকার আয় করেছিল প্রায় ১০.২৭ কোটি টাকা। সে জায়গায় এ বছর শুধুমাত্র জুন মাসেই বালির অবৈধ মজুত থেকে রাজ্যের রাজস্ব আদায় হয়েছে প্রায় ২০ কোটি টাকা। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এখনো পর্যন্ত রাজ্যের রাজস্ব আদায় প্রায় ৭ কোটি টাকা। বৈধ মজুত এবং বাকি গতিবিধি ঠেকাতে জেলা প্রশাসনের হানাও চলছে নিয়মিত। অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে গেলে জরিমানার খাতে আদায়ের পরিমাণ এখনকার তুলনায় নিশ্চয়ই কমবে। কিন্তু গোটা কাজকর্ম বৈধ ভাবে হতে হলে তা সরকারের পরিধির মধ্যেই থাকতে হবে। সে ক্ষেত্রে রাজস্বের গতি তুলনায় বাড়বে অনেকটা। বিগত সরকারের সময়ে বালির অবৈধ খনন-মজুত নিয়ে নানা সময়ে অভিযোগ প্রসাসনকে জানাতেন নাগরিকদের একাংশ। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির বদল ঘটেনি। তবে সরকারের এখনকার নীতি অনুযায়ী, খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধি কার্যকর হবে বাধ্যতামূলক ভাবে। তাতে যাঁরা সে কাজের লিজ পাবেন, সরকারের কাছে নির্দিষ্ট কর জমা করে তবে তাঁদের কাজ করতে হবে। আবার বিধির অতিরিক্ত কিছু প্রশাসনিক ছাঁকনিতে আটকালে তার থেকেও জরিমানা পেতে পারে নবান্ন। মানে এত দিন পকেটে ঢোকা অর্থই এখন রাজকোষে ঢুকছে।

অতিথি কলম

রক্তিম পাতর

দিল্লির লালকেল্লায় জমায়েত লক্ষ লক্ষ জনজাতি মানুষের দাবি

জনজাতি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায় ধর্মান্তরিতদের বিশেষ সুবিধা নয়

এতবছর ধরে যে সব বিষয়ে তারা গর্ব অনুভব করত, মিশনারিদের অপপ্রচারের ফলে এখন সেসবই তাদের লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিণামে তারা যেমন তাদের শিকড় হারিয়ে ফেলেছেন, তেমনই আবার বিদেশি সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণভাবে নিজেদের মেলাতে পারছেন না।

নয়াদিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার চারপাশে যে বাতাস খেলে বেড়াচ্ছিল ২৪ মে, ২০২৬-এর সকালে— সেই বাতাস যেন বয়ে আনল বহু প্রজন্ম ধরে স্মরণে রাখার মতো এক উৎসাহী বার্তা। দু'লক্ষেরও বেশি জনজাতি নারী-পুরুষ তাঁদের পরম্পরাগত পোশাকে সজ্জিত হয়ে, তাঁদের সমাজের নিশান উড়িয়ে, ভগবান বীরসা মুণ্ডার জয়গান করতে করতে লালকেল্লার চত্বরে এসে সমবেত হলেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এটি ছিল ভারতীয় জনজাতি সমাজের একটি শক্তিশালী প্রদর্শন। উপলক্ষ্য ছিল ভারতীয় জনজাতি জনগোষ্ঠীর প্রবাদপুরুষ, বরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং জনজাতি সমাজের আধ্যাত্মিক জননায়ক ভগবান বীরসা মুণ্ডার ১৫০তম জন্মজয়ন্তী। ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনে ভয়াবহ অত্যাচার এবং অন্যান্য সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। ভারতজননীর এই বীর সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন এবং তাঁকে স্মরণের মধ্যেই এই সমাবেশ সীমাবদ্ধ থাকেনি; এদিনের সমাবেশ থেকে উঠে আসে জনজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার লাভের কণ্ঠস্বর। 'জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ'-নামক সংগঠনের পক্ষ হতে তাঁরা একটি জোরালো দাবি উত্থাপন করলেন। ধর্মান্তরণের মাধ্যমে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন বা খ্রিস্টানে পরিণত হয়েছেন--- ভারতীয় সংবিধানের ৩৪২ নং অনুচ্ছেদ সংশোধনের দ্বারা তাদের নাম এসটি (শিডিউল্ড ট্রাইব বা তপশিলি উপজাতি)-র তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। সেদিনের সমাবেশে সমবেত জনজাতিরা সমস্বরে আওয়াজ তুললেন— তাঁদের যে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে, সেই সুরক্ষা বলয় যেন দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত ও ধ্বংস হচ্ছে। এই সাংবিধানিক অনুচ্ছেদের সংশোধন জরুরি, কারণ ইতিমধ্যেই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।

এই আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল জনজাতি ভাবাবেগকে বুঝতে হলে সেই মহাপুরুষের জীবনাদর্শের সম্যক উপলব্ধি প্রয়োজন— যাঁর জন্মজয়ন্তী জনজাতিদের মধ্যে এই ভাবাবেগ সঞ্চারিত করেছে তিনি হলেন— ভগবান বীরসা মুণ্ডা। অধুনা ঝাড়খণ্ডে ১৮৭৫ সালে তাঁর জন্ম। সেখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা; সেখানেই তিনি হয়ে ওঠেন প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রতিমূর্তি। বনবাসী, জনজাতিদের জল-জমি-জঙ্গলের অধিকার হতে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে, ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তিনি 'উলগুলান' আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। 'উলগুলান' শব্দের অর্থ মহাবিদ্রোহ। সনাতন ধর্মী জনজাতিদের জীবনযাত্রার ধরন, তাঁদের পরম্পরা, তাঁদের সংস্কৃতি— এককথায় তাঁদের আত্মপরিচয়কে ঔপনিবেশিক শক্তি ও খ্রিস্টান মিশনারিদের হাত থেকে রক্ষার জন্য তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। জনজাতিদের আত্মপরিচয় রক্ষার লড়াইয়ে তিনি তাঁর জীবন দান করেছিলেন। এদিন ভগবান বীরসা মুণ্ডার ১৫০তম জন্মজয়ন্তীতে দু'লক্ষাধিক জনজাতি জনগণের সমবেত হওয়া এবং সেখান থেকে এই দাবি উপস্থাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখনও জনজাতিরা তাঁদের আত্মপরিচয় রক্ষার লড়াই করে চলেছেন, অবশ্য তির-ধনুক নিয়ে নয়— গণতান্ত্রিক উপায়ে।

কোনো রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কাদের 'তপশিলি উপজাতি' হিসেবে চিহ্নিত করা হবে, তার ক্ষমতা ৩৪২ নং অনুচ্ছেদ বলে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে দিয়েছে ভারতীয় সংবিধান। তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের তালিকা একবার ঘোষিত হয়ে গেলে সেই তালিকাভুক্ত প্রান্তিক মানুষেরা সরকার -পোষিত শিক্ষা, সরকারি চাকুরি, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা এই অনুচ্ছেদ বলে পেয়ে থাকেন, যাতে তাঁদের সার্বিক উত্তরণ ঘটে।

জনজাতি জনগোষ্ঠীগুলির দাবি খুব স্পষ্ট এবং সংবিধান-সম্মত। জনজাতিদের মধ্যে যারা তাদের ঐতিহ্য, পরম্পরা, নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি পরিত্যাগ করে খ্রিস্টান বা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে, তারা কোনোভাবেই তপশিলি উপজাতি গোষ্ঠীর আত্মপরিচয় রক্ষার লক্ষ্যে যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, সেসব পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না। জনজাতি সমাজের এই দাবি খুব জোরালো ও যুক্তিনির্ভর। 'তপশিলি উপজাতি'র স্বীকৃতি জনজাতিদের শুধুমাত্র আর্থ-সামাজিক উত্তরণের লক্ষ্যে দেওয়া হয় না; এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁদের সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং তাঁদের আত্মপরিচয়ের শিকড় রক্ষার কবচ— প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের সামাজিক-আধ্যাত্মিক বন্ধন রক্ষা করার কবচ। তাঁরা যখন আব্রাহামিক রিলিজিয়ন বা মজহবে মতান্তরিত হচ্ছে, তখন তাদের আর সেই আত্মপরিচয়ের প্রয়োজন থাকে না। তারা তখন অ-ভারতীয় উপাসনা পদ্ধতির অঙ্গীভূত হয়ে যায়— যাদের রয়েছে নিজস্ব নেটওয়ার্ক, নিজস্ব উপায়, নিজস্ব সম্পদ ও নিজস্ব সংস্থান।

এখানে দাবিটা শুধুমাত্র এই ধর্মান্তরিতদের

বাদ দিয়ে দেওয়া নয়। জনজাতিদের দাবি হলো সেই সাংবিধানিক কাঠামোটিকে বাঁচানো, যা নির্মিত হয়েছে নির্দিষ্ট জনজাতি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও আত্মপরিচয় রক্ষার জন্য। জনজাতিদের মধ্যে ঘটে চলা এই 'ধর্মান্তরণ'কে রাজনৈতিকভাবে বিমূর্ত একটি ঘটনা হিসেবে দেখলে তা ঠিক হবে না। ভারত জুড়ে জনজাতি সমাজের একটি জীবন্ত ও অতি- সংবেদনশীল ঘটনা হিসেবে এটিকে দেখতে হবে। শত শত বছর ধরে জনজাতি সমাজের মানুষজন তাঁদের অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। তাঁদের নাচ-গান, মৌখিক সাহিত্য, তাঁদের উৎসব, কৃষিকাজ, তাঁদের পরম্পরা, প্রকৃতির সঙ্গে, নদ-নদীর সঙ্গে তাঁদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক— এসব কিছুর মধ্যেই মানব সভ্যতার প্রতি তাঁদের অবদান চির-প্রবাহিত হয়ে চলেছে— যা একান্তই ভারতীয় সভ্যতা- সংস্কৃতির প্রতিরূপ।

ভারতের কিছু অঞ্চল, যেমন— ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, উত্তর-পূর্ব ভারত ও মধ্য ভারতের কিয়দংশে জনজাতিদের একাংশের খ্রিস্টান বা ইসলামে ধর্মান্তরণের ফলে এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী উৎসব-অনুষ্ঠান, পূজাপার্বণ, আচার-বিচারকে পরিত্যাগ করে ধর্মান্তরণে উৎসাহিত করা হচ্ছে; অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য করা হচ্ছে, রীতিমতো জোরজবরদস্তি করা হচ্ছে। ধর্মান্তরণের পর তাঁদের নামও পরিবর্তন করে দেওয়া হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক ফাটল শুধু এটুকুতেই থেমে নেই। বংশপরম্পরায় ধর্মান্তরিত পরিবারগুলি তাদের নিজস্ব জনজাতি ভাষাকেও ভুলে যাচ্ছে, নিজেদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি- শিল্পকলাকে ভুলে গিয়ে নিজেদের সমাজের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয় হচ্ছে এই ধর্মান্তরণের ফলে এইসব জনজাতি সমাজের মানুষেরা তাঁদের প্রাচীন জল-জঙ্গলের সভ্যতা-সংস্কৃতি ছেড়ে বিদেশি সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ করছে, তাদের উপাসনালয়ে গিয়ে দুর্বোধ্য পাশ্চাত্য ভাষায় প্রার্থনা করছে। শ্রেণীবিন্যাস-অনুযায়ী যে জনজাতির লোকই হোন না কেন, এই ধর্মান্তরিত জনজাতি লোকেরা যখন তাদের দেবদেবীর প্রতি, তাদের উৎসবের প্রতি, তাদের আচার-বিচারের প্রতি, তাদের সংস্কৃতির প্রতি আর অনুরক্ত থাকেন না, তখন তাদের আর সেই জনগোষ্ঠীর লোক বলা চলে না।

উত্তর-পূর্ব ভারতের একজন জনজাতি ব্যক্তি হিসেবে এই মর্মান্তিক ঘটনা এই প্রতিবেদক প্রত্যক্ষ করেছে। এই প্রতিবেদকের জনগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের পিতৃপুরুষের বংশপরম্পরাগত অতীত ঐতিহ্য, গানবাজনা, সংস্কৃতি ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে খ্রিস্টমত গ্রহণ করে আমূল পালটে গিয়েছে। সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার হলো--- এদের যে ধর্মবিশ্বাস পালটে গিয়েছে তাই নয়, এইসব ব্যক্তি যারা একসময় ফসল-কাটার উৎসব করত, যারা লোকসঙ্গীত গাইতো, যারা অরণ্যের ভাষা বুঝতো, ধর্মান্তরণের পর তারা তাদের পিতৃপুরুষের সংস্কৃতি ও রীতিনীতিকে আদিম অন্ধপ্রথা বলছে। তারা বলছে যে, এসব পাপ কাজ। যে সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে তারা একদিন মানুষ হয়েছে, তাকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচার করে বেড়াচ্ছে।

এ কোনো স্বাভাবিক পরিবর্তন নয়। প্রায় ২০০ বছর ধরে খ্রিস্টান মিশনারি ও তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সুসংগঠিত ভাবে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও মনোবৈজ্ঞানিক উপায়ে এদের মূলোচ্ছেদ করার কাজে লেগে রয়েছে— এ তারই ফল। এইসব ধর্মান্তরিত জনজাতিদের শেখানো হয় যে যাঁরা এতদিন জড়িবুটি দিয়ে তাদের চিকিৎসা করেছে— তাঁরা ডাইনি; তাঁরা এতদিন যেসব পূজার্চনা করেছে, তা হলো শয়তানের পূজা; তাঁদের প্রাচীন দেবদেবী সব ফালতু ইত্যাদি। এতবছর ধরে যে সব বিষয়ে তাঁরা গর্ব অনুভব করত, মিশনারিদের অপপ্রচারের ফলে এখন সেসবই তাঁদের লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিণামে দেখা যাচ্ছে এইসব লোকেরা যেমন তাদের শিকড় হারিয়ে ফেলেছে, তেমনই আবার বিদেশি সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণভাবে নিজেদের মেলাতে পারছে না। নিজভূমেই যেন তারা 'সাংস্কৃতিক অনাথ'-এ পরিণত হয়েছে। একে এক ধরনের সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসও বলা যায়। লালকেল্লার চত্বরে দু'লক্ষ লোকের সম্মিলিত দাবি উঠেছে--- 'যারা আমাদের সমাজ ছেড়ে চলে গিয়েছে, তারা যেন আমাদের সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সুযোগ-সুবিধা ভোগ না করতে পারে।'

যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, এটা কোনো ধর্মবিশ্বাস বা উপাসনা পদ্ধতির প্রতি ঘৃণার কথা নয়। এটা ভারতের সাংবিধানিক অখণ্ডতা রক্ষার ব্যাপার। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তাদের দেওয়া একাধিক রায়ে বলেছে যে, এসটি-স্ট্যাটাস বা তপশিলি উপজাতির মর্যাদা একটি জাতিগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়স্বরূপ। এই স্বীকৃতি তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত বিষয়। ভারতীয় সংবিধান ও আইন বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন--- যে সমস্ত উপজাতি গোষ্ঠী ধর্মান্তরিত হয়ে গিয়েছে, এসটি-র সুযোগ সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে ওই জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন হবে না, বরঞ্চ সামাজিক বৈষম্যই বেড়ে যাবে।

ভগবান বীরসা মুণ্ডা যিনি তাঁর সমাজের লোকজন যাতে কোনোভাবে ছিন্নমূল না হয়ে যান, তার জন্য লড়াই করেছিলেন; তাঁর জন্মজয়ন্তীতে লালকেল্লা চত্বরে সমবেত হয়ে বনবাসী, জনজাতি জনগণ এই ঐতিহাসিক বার্তাটিই যেন দিতে চেয়েছেন। তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে, তাঁরা শুধুই কিছু সুবিধাভোগী ভোটব্যাংক নন, তাঁরা সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অমূল্য সম্পদ। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের নিবিড় সম্পর্ক, জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে তাঁদের অগাধ জ্ঞান, তাঁদের মৌখিক ইতিহাস, তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ পরিচালনার জ্ঞান থেকে আধুনিক নাগরিক শিল্প-সভ্যতার মানুষের অনেক কিছু শেখা ও পাওয়ার রয়েছে।

(লেখক সেন্টার ফর হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ, জেএনইউ-এর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর)

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক বাদল রায় গত ১১ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫১ বছর। তিনি প্রথমে মালদা জেলার পাকুয়াহাটে প্রচারক হিসেবে আসেন। পরে গাজোল, তারপর আলিপুরদুয়ার গ্রাম বিকাশের দায়িত্ব, তারপর শিলিগুড়ি বস্তুভাণ্ডার এবং শেষে কোচবিহার কার্যালয় প্রমুখ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কালিয়াগঞ্জ ফরিদপুর শাখার স্বয়ংসেবক ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে চলেছে 'স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ'

সম্প্রতি 'কিউএস-১০০ বিশ্ববিদ্যালয়' বা বিশ্বের প্রথম ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনোর ক্ষেত্রে এরাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের টিউশন ফি ও মেডিক্লেম (স্বাস্থ্যবিমা) দেওয়ার প্রকল্প ঘোষণা করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এই 'স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ' ঘোষণার কারণ কী? এছাড়াও 'স্কিম ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর রেজিস্টার্ড জব-সিকার্স'-এর মাধ্যমে এরাজ্যের যুবক-যুবতীদের স্কিল ট্রেনিঙের জন্য ৫ হাজার টাকা বা কোর্স ফি-র ৫০ শতাংশ অর্থ রাজ্য সরকার দেবে বলে ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দাদনপাত্রবাড়ে প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আগামী কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গ-সহ উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ভবিষ্যৎ পাল্টে যাবে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবধান তখন দ্রুত কমবে। ২০৪৭-এ 'বিকশিত ভারত' গঠন করতে হলে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারত পিছিয়ে থাকলে হবে না। এক্ষেত্রে এই নতুন সমুদ্র বন্দরটি 'গেম চেঞ্জার' হয়ে উঠতে পারে। এমতাবস্থায় যদি বাঙ্গালি সমাজের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ না থাকে; তাঁরা যদি উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠতে না পারে— তবে তারা ডেইলি লেবার বা দৈনিক মজুরিতে কর্মরত শ্রমিকে পরিণত হবে এবং অন্যান্য রাজ্যের যোগ্যরা এরাজ্যে কর্মসংস্থানের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করবে। ৩৪ বছর বামফ্রন্ট শাসনের পর একশ্রেণীর তথাকথিত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা যেভাবে আজ এরাজ্যের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরায়। গত ৫০ বছরে বামফ্রন্ট ও তৃণমূল কংগ্রেস জমানায় এরাজ্যের স্কুল-কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে, পড়াশোনার পরিবেশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভালো মানের শিক্ষক- শিক্ষিকার খুব অভাব। আগামী এক দশক অর্থনীতি, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে খুব দ্রুত সংস্কার আনলেও, এই দশ বছরে ১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গ যেখানে ছিল, সেই জায়গায় ফেরানো অসম্ভব। তেলেঙ্গানা-অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যে যেখানে উচ্চমানের পড়াশোনার প্রচলন রয়েছে--- সেই রাজ্যগুলিতেই একটি নতুন ইনস্টিটিউট তৈরি করতে এবং তা সেখানে পড়াশোনা ও গবেষণার কাজ পুরোদমে শুরু করতে ১০ বছর সময় লেগে যায়। সেখানে এরাজ্যে তো আরও সময় লাগবে যেখানে যারা শিক্ষা জগতের সর্বেসর্বা হয়ে বসে থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে তারা প্রত্যেকে 'হোয়াইট কলার হিন্দু জাহাঙ্গির বা শাহজাহান'।

প্রতিবছর এ রাজ্যে সরকারি ও সরকার-পোষিত কলেজগুলিতে লক্ষ লক্ষ আসন খালি থাকছে। উচ্চবিত্তদের ছেলেমেয়েরা বেসরকারি এডুকেশন মাফিয়াদের কলেজে ভর্তি হচ্ছে ডিগ্রি কিনতে এবং উচ্চ মাধ্যমিকের পর গরিব ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু সময় তো পিছিয়ে থাকবে না! কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেক্ট্রনিক্স, ডেটা সায়েন্স, প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ গবেষণা, ওষুধ, সার ও রাসায়নিক শিল্পে অনেক এগিয়ে গিয়েছে দক্ষিণ ভারত। আগামীদিনে অর্থনৈতিক বিকাশের পথে পশ্চিমবঙ্গ পরিচালিত হলে এরাজ্যে যখন বড়ো বিনিয়োগ আসবে, তখন বাঙ্গালি ছেলেমেয়েরা চাকরি পাবে না। উপযুক্ত দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাবে কর্মসংস্থানের প্রতিযোগিতায় তারা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়বে। এরাজ্যে ক্রিয়াশীল কোম্পানিগুলি দক্ষিণ ভারতে যাবে বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ইন্টারভিউ করে কর্মী নিয়োগ করতে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, কলকাতায় পোস্তা ব্রিজ যদি রাজ্য সরকার আবার পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়, তবে সেই প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার মেরেকেটে ১ বা ২ জন রয়েছেন। অথচ কয়েক হাজার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কলকাতায় থাকেন। আগামীদিনে কর্মসংস্থানের প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালি পিছিয়ে পড়লে তখন এই 'হিন্দু জাহাঙ্গির শাহজাহান'রা বাংলা পক্ষ বানিয়ে গণ্ডগোল শুরু করবে। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই অভিনব উদ্যোগ। আগামী দশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের সেরা মানবসম্পদকে বিশ্বের প্রথমসারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাঠিয়ে, সরকারি আর্থিক সাহায্যে তাঁদের তৈরি করা। উদ্দেশ্য বাঙ্গালি সমাজের উন্নত প্রজন্ম তৈরি যারা আগামীদিনে গোটা সমাজকে পথ দেখাবে। যেমন একসময় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ড. মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বরেণ্য বিজ্ঞানীদের নেতৃত্ব-আধারিত একটা শ্রেণী ছিল, তেমনভাবে দক্ষ গবেষক, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ-সংবলিত একটি অভিভাবক শ্রেণী আগামীদিনে তৈরি হোক। বিশ্বের সেরা ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে যদি পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা করে ৫ বা ১০ বছর পরে ফিরে এসে এরাজ্যের শিক্ষা- গবেষণার হাল ধরে, তবে আগামী এক দশকে শিক্ষা ও অর্থনীতিতে পশ্চিমবঙ্গের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার হতে পারে। বিদেশে যাওয়ার প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে কোচিং নেওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ৩০,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে একই কারণে। তাঁরা SAT, GRE, ILTS ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিলে রাজ্য সরকার তাঁদের এই সাহায্য করবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এরাজ্যের আগামী প্রজন্মের জন্য ভাবছে। গত ২২ জুন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাশ হওয়া রাজ্য বাজেট কিন্তু ১৯৯১-এর নরসিংহ রাওয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বকালীন বাজেটের মতো যুগান্তকারী বাজেট। কারণ রাজ্য সরকারের আয়-ব্যয়ের কোনো সাধারণ হিসাব নয় এই বাজেট। বাঙ্গালি ছাত্র-ছাত্রীদের এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে পড়াশোনা করতে হবে। ভালো সময় আসবেই। তাঁদের হাতে ডিভিডেন্ড তুলে দেওয়ার জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার এমন চিন্তাভাবনা করেছে ক্ষমতাসীন হওয়ার মাত্র এক মাসের মধ্যে। 'স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ' তার প্রমাণ। যদি দশ বছরে এই বিশ্বের প্রথমসারির ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া এই সেরা বাঙ্গালি ছেলেমেয়েদের ২৫ শতাংশও এরাজ্যে ফিরে আসে এবং রাজ্য গঠনে আত্মনিয়োগ করে, তবে কয়েক দশক পরে পশ্চিমবঙ্গের চেহারা পাল্টে যাবে। এ বিশ্বের বুকে বাঙ্গালি বেঁচে থাকবে ইহুদিদের মতো। ইরানিদের মতো দাস হয়ে তাঁরা বাঁচবে না। □

পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা বন্ধ থাকার পর্ব ভারতের ইতিহাসের অজ্ঞাত অধ্যায়

মুসলমান আক্রমণকারীরা ছলচাতুরি ও কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধে জয় পেয়ে নানা কূটপন্থায় ভারত জুড়ে ইসলামের বিস্তার করেছিল। ঠিক তেমনি পাল্টা কৌশল ও চতুরতায় ওড়িশার রাজারা ইসলামি আগ্রাসন রুখে দিয়েছিলেন; এমনকী প্রয়োজনে ইসলাম গ্রহণ করে ছদ্ম-মুসলমানে পরিণত হয়েও পুরীর শ্রীমন্দির রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ওড়িশায় ইসলামের প্রসার রুখে দিতে তাঁরা সমর্থ হয়েছিলেন।

দীপল বিশ্বাস

হাজার বছর ধরে চলমান পুরীর রথযাত্রা আজ বিশ্বব্যাপী প্রসারিত এক উৎসব। দেশ-জাতি-সমাজের গণ্ডি অতিক্রম করে রথযাত্রা আজ এক আন্তর্জাতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য ভারতীয়দের মতো বাঙ্গালিরও প্রাণের এই রথযাত্রা যে টানা ২৫ বছর মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেবের আমলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা ক'জন বাঙ্গালি জানে? পুরীর রথযাত্রা বন্ধ হয়ে যাওয়ার এই ইতিহাস বাঙ্গালিদের জানতে দেওয়া হয়নি।

বামপন্থীরা নানা কায়দায় বরাবরই হিন্দু বিরোধিতা করে। সম্প্রতি বাম নেতা ও আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন যে, ৫০০ বছরের ইসলামি শাসনে হিন্দুরা অনেক ভালো ছিল! তিনি নির্বিকারে বলেন যে, মুসলমানরা তখন মন্দির ভেঙেছে, আবার গড়েছে; তাও হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি বজায় ছিল। এখনকার থেকে তখন পরিস্থিতি ভালো ছিল, যেন মন্দির ভাঙ্গাটা তুচ্ছ ঘটনা ছিল, কোনো অশান্তি ছাড়াই তা হয়েছিল। সত্যিই ইতিহাস কি তাই বলে? এখানেই তো রয়েছে আসল প্যাঁচ! হিন্দু বিরোধিতার প্রেক্ষিতে নেহরুর সঙ্গে বামপন্থীদের জোট হলো। কংগ্রেস সরকার ইরফান হাবিব, নুরুল হাসান, রোমিলা থাপারের মতো বামপন্থী ইতিহাসবিদদের কাজে লাগালো ইতিহাস রচনায়। দেশে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' বজায় রাখার অজুহাতে, ভারতে ইসলামি শাসনের অত্যাচার ও নৃশংসতার দিকটা সম্পূর্ণভাবে চেপে দেওয়ার লক্ষ্যে ইতিহাস বিকৃতিতে সক্রিয় হলো এই তথাকথিত ইতিহাসবিদরা। আজ আবার সেই সত্য চেপে যাওয়া ইতিহাসটাকেই তথ্যপ্রমাণ বানিয়ে ইসলামি শাসনের প্রশস্তি করছে কংগ্রেস-বামপন্থীরা। তাই আজ সময় এসেছে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে চেপে যাওয়া হিন্দুবিরোধী অত্যাচার, নৃশংসতার ঘটনাগুলিকে তুলে এনে ইতিহাস পুনর্লিখনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা। কারণ প্রকৃত ইতিহাস না জানলে হিন্দু জাতি স্বাভিমানী হয়ে উঠতে পারবে না। এরকমই অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা পুরীর মন্দির ভেঙে ফেলার নির্দেশকে কেন্দ্র করে মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেবের ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দের ফরমান— ফার্সিতে লেখা যে ফরমান আজও দিল্লির মহাফেজখানায় সংরক্ষিত আছে। কী ছিল সেই ঘটনা সেই আলোচনার জন্য আজ এই নিবন্ধের অবতারণা।

এবছর পুরীর রথযাত্রা আয়োজিত হতে চলেছে আগামী ১৬ জুলাই। শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে সাড়ম্বরে আয়োজিত হবে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, বলভদ্র ও সুভদ্রার মাসির বাড়ি যাওয়ার বার্ষিক অনুষ্ঠান। রথযাত্রার ইতিহাসের পাতা উল্টোলে দেখা যায় বারবার হামলার শিকার হয়েছে পুরীর রথযাত্রা ও জগন্নাথ মন্দির। ইসলামি শাসকদের হামলার কারণে রথযাত্রার অনুষ্ঠান এমনকী শ্রীমন্দিরের পূজাপাঠ বন্ধ রাখতে হয়েছে। ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মজহবি গোঁড়ামি সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়। পুরীর জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করার জন্য একটি ফরমান জারি করে ঔরঙ্গজেব। বঙ্গপ্রদেশের সুবেদার আমির-উল -উমার-কে মন্দির ধ্বংস করতে নির্দেশ দেয় মুঘল বাদশা। ফরমান পেয়ে মুঘল সুবেদার মন্দির ধ্বংস করার জন্য পুরীতে পৌঁছল। ওড়িশা মুঘল শাসনাধীনে থাকলেও সেই সময় সেখানে রাজা গজপতি শ্রীমন্দিরের রক্ষক হিসাবে কাজ করছিলেন। শ্রীমন্দির ধ্বংসের বিষয়টি জানার পর সর্বত্র ক্রোধ ও হতাশা ছড়িয়ে পড়ে, অবশেষে শ্রীমন্দির রক্ষার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। মুঘল সুবেদারকে ঘুষ হিসেবে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই ঝুঁকি নিতে ঔরঙ্গজেবের ভয়ে সুবেদার প্রথমে সাহস পায়নি। কিন্তু ঘুষের পরিমাণ বিশাল করে তাকে এই প্রস্তাবে সম্মত করতে সফল হয় ওড়িশাবাসী। তিনি ঔরঙ্গজেবকে মিথ্যে বোঝান যে, শ্রীমন্দির ধ্বংস করা হয়েছে, আসল শ্রীশ্রীজগন্নাথের একটি প্রতিরূপ তৈরি করে ঔরঙ্গজেবকে বিভ্রান্ত করার জন্য সেটি দিল্লিতে পাঠানো হয়েছিল। পাশাপাশি জগন্নাথ মন্দির অস্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পূজাপাঠ, আচার-অনুষ্ঠান, রথযাত্রা, তীর্থযাত্রা সব সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস হয়েছে বলে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ঔরঙ্গজেব বিশ্বাস করেছিল যে, শ্রীমন্দির ধ্বংস হয়েছে। তখন আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও টেলি যোগাযোগ না থাকার সুযোগ সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছিল ওড়িশাবাসী। তাছাড়া সেই সময় একদিকে

ফঃ ২

দক্ষিণ ভারতে বিদ্রোহ, দিল্লি ও হরিয়ানায় জাঠ কৃষক বিদ্রোহ এবং ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের নেতৃত্বে মারাঠাদের উত্থানকে দমন করতে ঔরঙ্গজেব এতই ব্যতিব্যস্ত ছিল যে তখন আর ওড়িশা অভিমুখে গমন করতে পারেনি। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শ্রীমন্দিরের দরজা আবার খুলে দেওয়া হয়। ১৬৮২ থেকে ১৭০৭ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেবের শাসনকালের শেষ ২৫ বছর পুরীর রথযাত্রা বন্ধ ছিল। তার মৃত্যুর পর পুনরায় রথযাত্রা শুরু হয়।

এছাড়াও বারবার হামলার শিকার হয়েছে পুরীর রথযাত্রা। ১৫৬৮ সাল থেকে ১৭৩৫ সালের মধ্যে বহুবার বন্ধ থেকেছে পুরীর রথযাত্রা। ইসলামি শাসকদের হামলার কারণে কোন কোন সময়কালে পুরীর রথযাত্রা স্থগিত থেকেছে— ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তারও উল্লেখ রয়েছে।

১৫৬৮ সালে বঙ্গের শাসক সুলেইমান কিররানির সেনাধ্যক্ষ কালাপাহাড় পুরীর জগন্নাথ মন্দির আক্রমণ করে। সেই সময় ১৫৬৮ থেকে ১৫৭৭ সাল পর্যন্ত মোট ৯ বছর বন্ধ ছিল রথযাত্রা।

এরপর ১৬০১ সালে তৎকালীন বঙ্গের শাসক মানসিংহের সেনাপতি মির্জা খুররম হামলা চালায় পুরীর মন্দিরে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি রক্ষা করতে মূর্তিগুলিকে পুরী থেকে ১৩-১৪ কিলোমিটার দূরে কপিলেশ্বরের পঞ্চমুখী গোসানি মন্দিরে সরিয়ে নিয়ে যান শ্রীমন্দিরের পাণ্ডা ও সেবায়েতরা। সেই বছর রথযাত্রা বন্ধ থাকে।

১৬০৭ সালে ওড়িশার মুঘল সুবেদার কোয়াসিম খান হামলা চালায় জগন্নাথ মন্দিরে। মূর্তিগুলিকে বাঁচাতে লুকিয়ে খুড়দার শ্রীগোপাল জিউ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই বছরও রথযাত্রা হয় না।

১৬১১ সালেও বন্ধ থাকে রথযাত্রা। আকবরের সভাসদ টোডর মলের ছেলে কল্যাণ মল ওড়িশার সুবেদার হয়ে এসে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে হামলা চালায়। আগেই আক্রমণের খবর পেয়ে দেবত্রয়ীর মূর্তিগুলি চিলিকা হ্রদের মাহিসানসিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৬১৭ সালে আবার জগন্নাথ মন্দিরের হামলা চালায় কল্যাণ মল। তবে তার আসার আগেই তিনটি মূর্তি চিলিকা হ্রদের গুরুবাইগড়ে সরিয়ে ফেলা হয়।

এরপরে ১৬২১ ও ১৬২২— এই দুই বছর বন্ধ থাকে রথযাত্রা। মুসলমান সুবেদার আহমেদ বেগ শ্রীমন্দিরে হামলা করায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি বানাপুরের আন্ধারিয়াগড়ে সরিয়ে ফেলা হয়।

১৭৩১ সালে ওড়িশার সুবেদার মহম্মদ তাকি খান শ্রীমন্দিরে হামলা চালায়। চিলিকা হ্রদের কঙ্কনাশেখারি কুড়ায় সেবার লুকিয়ে রাখা হয় দেবত্রয়ীর মূর্তিগুলি। সেখান থেকে মূর্তিগুলি নিয়ে যাওয়া হয় খুরদার হরিশ্বর মণ্ডপে। সেখান থেকে আবার গঞ্জাম জেলার চিকিলি গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয় মূর্তিগুলি। সেই বছরও অনুষ্ঠিত হয়নি পুরীর রথযাত্রা।

১৭৩৩ সালে ফের পুরীর শ্রীমন্দিরে হামলা চালায় তাকি খান। সেবারও পুরোহিতেরা প্রথমে হরিশ্বর মণ্ডপ এবং সেখান থেকে গঞ্জাম জেলার মারদা মন্দিরে লুকিয়ে রাখেন দেবত্রয়ীর মূর্তিগুলি। এর ফলে ১৭৩৩ থেকে ১৭৩৫ সাল পর্যন্ত বন্ধ থাকে পুরীর রথযাত্রা।

এত বার চেষ্টা সত্ত্বেও জগন্নাথ মন্দির অক্ষত থাকার প্রধান কারণ ছিল এই যে, মুঘল বাদশা আকবরের শাসনকাল পর্যন্ত ওড়িশা একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল।

আকবরের শাসনামলে মন্দির সংক্রান্ত বিষয়ে তেমন হস্তক্ষেপ ছিল না। মান সিংহ সমগ্র বঙ্গপ্রদেশের মুঘল সুবেদার হিসেবে কাজ করতেন। টোডর মল ছিলেন আকবরের শাসনামলের মন্ত্রী, যিনি ওড়িশা শাসন করেছিলেন। তারা সকলেই আকবরের অধীনে হিন্দু রাজা ছিলেন এবং শ্রীমন্দিরের কোনো ক্ষতি করেননি। কিন্তু জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের শাসনামলে শ্রীমন্দিরের উপর আক্রমণ বেড়ে যায় এবং মন্দিরের ধনসম্পদ লুট করা হয়। ভারত জুড়েই এমনটা ঘটছিল, তবু নানা পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়েছিল এবং মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল ১৬৮২ সাল পর্যন্ত ভগবান শ্রীজগন্নাথের পূজা বন্ধ হয়নি।

বিভিন্ন সময় নানাভাবে সবরকম আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছিল শ্রীমন্দির। মন্দির অক্ষত রাখতে স্থানীয় রাজা ও পুরোহিতদের সর্বদা সক্রিয় ভূমিকা ছিল। স্থানীয় মুসলমান শাসকদের ধনসম্পদ ঘুষ দিয়েও শ্রীমন্দির রক্ষা করেছেন ওড়িশার রাজা ও শ্রীজগন্নাথ ভক্তরা।

কথিত যে, কয়েকজন ওড়িয়া রাজাও ভগবান শ্রীজগন্নাথকে রক্ষা করার জন্য অন্তরে হিন্দু থেকেও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বহিরঙ্গে। খুরদার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজা শ্রীরামচন্দ্র দেব তাঁর রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের নাম পরিবর্তন করে হাফিজ কাদের রাখেন। এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে মুক্তি মণ্ডপ তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করার পরেও রথযাত্রার সময় রাজপথে ঝাড়ু দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথের পূজার অধিকার সকলের ছিল। ইসলাম গ্রহণকারী খুরদার রাজা শ্রীমন্দিরে প্রবেশ না করেই সিংহদ্বার থেকে তাঁর পূজা করতে পারতেন।

নিয়ম অনুযায়ী আজও পুরী শ্রীমন্দিরে বিধর্মীদের প্রবেশাধিকার নেই। প্রভু শ্রীজগন্নাথের এক মহান ভক্ত শাল বেগের নাম উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি ছিলেন ওড়িশার মুঘল সুবেদার লাল বেগের পুত্র এবং পুরী শ্রীমন্দিরের ক্ষতি না করার জন্য মুঘলদের প্রভাবিত করেছিলেন। শাল বেগের সমাধি পুরী শহরে অবস্থিত এবং আজও রথযাত্রার সময় ভগবান শ্রীজগন্নাথের রথ সেখানে কিছুক্ষণ থামে। ব্রিটিশ আমলে শ্রীমন্দিরের বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করা হয়নি এবং আমরা পুরীর শ্রীমন্দিরকে আজও ঠিক তেমনই দেখতে পাই।

ইতিহাসের পর্যালোচনা করতে গেলে পরিশেষে একটা কথা বলতেই হয়। মুসলমান আক্রমণকারীরা ছলচাতুরি ও কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধে জয় পেয়ে নানা কূটপন্থায় ভারত জুড়ে ইসলামের বিস্তার করেছিল। ঠিক তেমনি পাল্টা কৌশল ও চতুরতায় ওড়িশার রাজারা ইসলামি আগ্রাসন রুখে দিয়েছিলেন; এমনকী প্রয়োজনে ইসলাম গ্রহণ করে ছদ্ম-মুসলমানে পরিণত হয়েও পুরীর শ্রীমন্দির রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ওড়িশায় ইসলামের প্রসার রুখে দিতে তাঁরা সমর্থ হয়েছিলেন। সেই সাফল্যের প্রমাণ দিচ্ছে ওড়িশার বর্তমান জনবিন্যাস। সারা ভারতের মধ্যে সবথেকে কম মাত্র ২ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যা ওড়িশাতে, আর সেই কারণেই ওড়িশাতে কোনোদিন 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' হয়নি এবং ওড়িশা ভাগের দাবি ওঠেনি। এই অভিজ্ঞতা বাঙ্গালি হিন্দুদের ধর্ম, সংস্কৃতি রক্ষায় ও ভবিষ্যৎ পুনরুদ্ধারে কাজে লাগতে পারে। আর তাহলেই ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ঐতিহাসিক জয়কে সংহত করে সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারকল্পে বাঙ্গালি হিন্দুদের ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই সার্থক হবে।

পশ্চিমবঙ্গ বাজেট ২০২৬-২৭

‘উন্নত পশ্চিমবঙ্গ’ নির্মাণের পথে নতুন যাত্রা

পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬-২৭ সালের বাজেট একটি নতুন অর্থনৈতিক দর্শনের সূচনা করেছে। উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে আনা হয়েছে কর্মসংস্থান, উৎপাদন, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক ভারসাম্যকে।

ডঃ ধনপত রাম আগরওয়াল

(প্রথম পর্ব)

‘২২ জুন, ২০২৬’ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। এদিন রাজ্য বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত যে বাজেট পেশ করেন, তা কেবল সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়; এই রাজ্য বাজেট হলো এরাজ্যে প্রকৃত রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর নতুন সরকারের উন্নয়ন-দর্শনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। স্বাধীনতার পর এই প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ণ বাজেট উপস্থাপিত হল, যার মূল প্রতিপাদ্য— ‘উন্নত পশ্চিমবঙ্গ, উন্নত ভারত’।

প্রায় ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৭৫ কোটি টাকার এই রাজ্য বাজেটের বিশেষত্ব শুধু এর আকারে নয়, বরং এর দৃষ্টিভঙ্গিতে। গত দেড় দশকেপশ্চিমবঙ্গে জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির বিস্তার ঘটলেও শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো এবং এরাজ্যের মধ্যে আঞ্চলিক ভারসাম্য নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। নবনির্বাচিত রাজ্য সরকার সেই চেনা পথ থেকে কিছুটা সরে এসে উৎপাদন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং পরিকাঠামোকে উন্নয়নের প্রধান ভিত্তি করার ইঙ্গিত দিয়েছে। এক কথায়, ভর্তুকিনির্ভর অর্থনীতি থেকে উৎপাদনমুখী অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হওয়ার একটি প্রচেষ্টা এই বাজেটে স্পষ্ট।

এই বাজেটের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো উন্নয়নযজ্ঞকে কলকাতা-কেন্দ্রিক

এই বাজেটের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো উন্নয়নযজ্ঞকে কলকাতা-কেন্দ্রিক না রেখে সমগ্র রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা। দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল, পাহাড়ি এলাকা এবং সুন্দরবন উন্নয়নের মূল স্রোতের বাইরে ছিল। এই বাজেটে প্রথমবারের মতো এই অঞ্চলগুলিকে পৃথক উন্নয়ন-পরিকল্পনার আওতায় এনে পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। উন্নয়নের আলো যদি কেবলমাত্র একটি শহরেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে রাজ্যের সামগ্রিক অগ্রগতি সম্ভব হবে না।

না রেখে সমগ্র রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা। দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল, পাহাড়ি এলাকা এবং সুন্দরবন উন্নয়নের মূল স্রোতের বাইরে ছিল। এই বাজেটে প্রথমবারের মতো এই অঞ্চলগুলিকে পৃথক উন্নয়ন-পরিকল্পনার আওতায় এনে পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। উন্নয়নের আলো যদি কেবলমাত্র একটি শহরেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে রাজ্যের সামগ্রিক অগ্রগতি সম্ভব নয়— এই উপলব্ধিরই প্রতিফলন ঘটেছে সদ্য পাশ হওয়া রাজ্য বাজেটে।

উত্তরবঙ্গের জন্য ঘোষিত পরিকল্পনাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোচবিহার বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ, মালদহ ও বালুরঘাটে নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ-সহ আইআইটি, আইআইএম, এইমস্ ও ক্যানসার হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাব উত্তরবঙ্গকে শুধু প্রশাসনিক নয়, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবেও গড়ে তোলার ইঙ্গিত বহন করে। একই সঙ্গে চা-বাগানের ন্যূনতম জমির সীমা ৩০ একর থেকে কমিয়ে ১৫ একর করার সিদ্ধান্তকে একটি সুদূরপ্রসারী সংস্কার বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। এর ফলে ছোটো চা-বাগানগুলিও বাণিজ্যিক স্বীকৃতি পাবে এবং ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে নতুন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

জঙ্গলমহলের জন্য ঘোষিত 'জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী' প্রকল্প এই বাজেটের অন্যতম আকর্ষণ। প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকার সম্ভাব্য বিনিয়োগ এবং প্রায় ৭৫ হাজার কর্মসংস্থানের লক্ষ্য শুধু শিল্পায়নের ঘোষণাই নয়, দীর্ঘদিন পিছিয়ে থাকা এরাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলকে অর্থনীতির মূলধারায় ফিরিয়ে আনার এক উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা। পাশাপাশি রাজ্য বাজেটে রাগি বা মিলেট চাষের সম্প্রসারণ, মৎস্যচাষ এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।

অন্যদিকে সুন্দরবনের জন্যও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বরাদ্দ, নদীবাঁধ নির্মাণে বিপুল বিনিয়োগ, নদীভাঙন রোধ এবং পৃথক সুন্দরবন জেলা গঠনের প্রস্তাব থেকে বোঝা যায়, এই অঞ্চলকে আর কেবল দুর্যোগপ্রবণ এলাকা হিসেবে নয়, সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেখা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় এই ধরনের বিনিয়োগ ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তবে ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড, কলকাতার মূল্যায়ন অনুযায়ী, এই আঞ্চলিক বরাদ্দগুলির দিকনির্দেশ ইতিবাচক হলেও সামগ্রিক বাজেটের তুলনায় এদের পরিমাণ এখনও সীমিত। অর্থাৎ সূচনা আশাব্যঞ্জক, কিন্তু প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনতে হলে আগামী কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিক বিনিয়োগ বজায় রাখতে হবে।

এই বাজেটের সামনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ অবশ্য অন্য জায়গায়। উত্তরাধিকার সূত্রে নবনির্বাচিত সরকার পেয়েছে প্রায় ৮.১৬ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বিপুল বোঝা, যা রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ৩৮ শতাংশের সমান। অর্থমন্ত্রী নিজেই এই ঋণভারকে 'উদ্বেগজনক' বলে উল্লেখ করেছেন। এত বড়ো ঋণের বোঝা নিয়ে উন্নয়নের গতি বজায় রাখা সহজ কাজ নয়।

তবু আশার দিকও রয়েছে। রাজস্ব ঘাটতি প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। রাজকোষীয় ঘাটতি কমে এফআরবিএম আইনের নির্ধারিত সীমার মধ্যে এসেছে এবং ঋণ-জিএসডিপি অনুপাতেও সামান্য উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। এই পরিসংখ্যানগুলি থেকে আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

তবে এই উন্নতির পিছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতাও রয়েছে। রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব বৃদ্ধির তুলনায় কেন্দ্রের অনুদান উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। অর্থাৎ আর্থিক অবস্থার উন্নতির বড়ো অংশই কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতার ফল। এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের গতি বজায় রাখা সহজ হবে; কিন্তু আগামীদিনে কোনো কারণে সেই সহায়তায় ভাটা পড়লে রাজ্যের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হতে পারে।

আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। এরাজ্যের ঋণের হার কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও মোট ঋণের পরিমাণ এখনও বাড়ছে। প্রতি বছর বিপুল অঙ্কের সুদ ও আসল ঋণ পরিশোধে রাজ্যের রাজস্বের বড়ো অংশ ব্যয় হচ্ছে। ফলে উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ব্যয় বাড়াতে হলে রাজস্ব সংগ্রহ এবং বিনিয়োগ— দুই ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে হবে।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশন এখনও কার্যকর হয়নি। যদিও কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বাড়ানো হয়েছে, তবু তা এখনও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের তুলনায় যথেষ্ট কম। ফলে আগামী দিনে এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নও রাজ্য সরকারের জন্য একটি বড়ো আর্থিক পরীক্ষাই হয়ে থাকবে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬-২৭ সালের বাজেট একটি নতুন অর্থনৈতিক দর্শনের সূচনা করেছে। উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে আনা হয়েছে কর্মসংস্থান, উৎপাদন, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক ভারসাম্যকে। তবে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনার সাফল্য শেষ পর্যন্ত নির্ভর করবে কত দ্রুত ঘোষণাগুলি বাস্তবে রূপ পায় এবং রাজ্যের আর্থিক শৃঙ্খলা কতটা দীর্ঘস্থায়ী হয় তার ওপর।

(ক্রমশ : দ্বিতীয় পর্বে শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ, ODOP–PATANOMICS এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন)

(লেখক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং প্রধান গবেষক ও প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড, কলকাতা)

With Best Compliments from -

A Well Wisher

বাংলাদেশি জেহাদিদের সীমাহীন আস্ফালন

ভারতের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি উগ্র জেহাদি গোষ্ঠী হিন্দু গণহত্যার হুমকি দিয়েছে প্রকাশ্যে। সেটি বায়বীয় হুমকি হলেও তাতে বিস্মিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে প্রতিটি নাগরিক নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার রাখে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য ২০২৪ সালে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিতাড়নের পর দেশটিতে যে অরাজকতা শুরু হয়েছে তা এখনো চলমান রয়েছে, এমনকী হিন্দুদের উপর নির্যাতনের নমুনা বদলেছে, নৃশংসতাও বেড়েছে আগেকর চাইতে অনেক বেশি। ভারতের বিরুদ্ধে লাগামহীন উসকানিমূলক বক্তব্য এবং পাকিস্তান প্রীতি বাংলাদেশের শান্তির মূলে কুঠারাঘাত করেছে। একদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির নতুন নতুন বয়ান; অন্যদিকে মজহবি উগ্রতা, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ এবং জেহাদিদের বাড়বাড়ন্ত গোটা দেশকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বাংলাদেশের উগ্র জেহাদি গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান আস্ফালন, ভারতের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তব্য এবং সামাজিক যোগাযোগ

ইতিহাস শেষপর্যন্ত তাদেরই মনে রাখে, যারা সেতু নির্মাণ করে। যারা ঘৃণার প্রচীর তোলে, সময়ের নির্মম স্রোত একদিন তাদেরকেই ইতিহাসের প্রান্তরে একা ফেলে রেখে যায়। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়।

মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া আগ্রাসী প্রচার হিন্দুদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের মতে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবর্তনকে ঘিরে বাংলাদেশের কিছু উগ্র গোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের ধারণা ছিল যে সীমান্ত রাজনীতি, অনুপ্রবেশ ইস্যু এবং ধর্মীয় পরিচয়ভিত্তিক ভোটের সমীকরণ ভবিষ্যতের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে তাদের অনুকূলে নিয়ে যাবে। বিজেপি দল বরাবরই অভিযোগ করে এসেছে যে মমতা এবং তাঁর দল সীমান্ত-সংক্রান্ত প্রশ্ন, অনুপ্রবেশ এবং পরিচয় রাজনীতির বিষয়ে পর্যাপ্ত কঠোর অবস্থান গ্রহণ না করে নমনীয় মনোভাব দেখিয়েছে। বিশেষত একটি জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক বিতর্ক এবং অভিযোগ সামনে এসেছে। এ নিয়ে সীমান্ত নিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে উদ্বেগ পশ্চিমবঙ্গবাসীর জনমনে ভীতির সঞ্চার করেছিল।

বাংলাদেশের রংপুরে হিন্দুরা নিজ অর্থে শ্রীরামের মূর্তি ও মন্দির স্থাপনের সিদ্ধান্তে জেহাদিদের গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। সরকারি টাকায় শত শত মসজিদ নির্মাণ হলেও হিন্দুদের নিজেদের টাকায় মন্দির করা যাবে না— এই হুমকির বিষয়ে সরকার নির্বিকার। অবশ্য এর

প্রতিবাদে সারা দেশে হিন্দুরা পথে নেমেছে। হিন্দুরা এখন আর বিনা চ্যালেঞ্জে কিছুই ছেড়ে দিচ্ছে না। হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সময়ের চাহিদাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। কারণ তারা বুঝে গিয়েছে যদি মরতেই হয় লড়াই করেই মরতে হবে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় ঢাকার বুকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে ফেলে রেখে গেছে বলে জানা গেছে। এছাড়া সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভু বিনা বিচারে দীর্ঘদিন কারাগারে বন্দি রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পরেও সরকারপক্ষ তার জামিনের বিরোধিতা করেই চলেছে। আইনের শাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সরকার নিরপেক্ষতাকে জলাঞ্জলি দিয়েছে।

একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিসরে পূর্বতন সরকারের মুসলমান তোষণ, ভোটব্যাংকের সমীকরণ এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে যে তীব্র বিতর্ক দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল, তা সনাতনী সমাজের একাংশের মধ্যেও অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সংখ্যাগুরু সমাজের উদ্বেগগুলো যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বাংলাদেশের কিছু উগ্র মোল্লাবাদী গোষ্ঠীর বক্তব্যে ভারতের বিরুদ্ধে অসংযত ভাষা এবং অবাস্তব দম্ভোক্তির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে বিভিন্ন মহলে আলোচনা রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা কিংবা সামরিক শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে যে ধরনের মন্তব্য করা হচ্ছে, তা বাস্তবতার সঙ্গে সাঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেই বিশ্লেষকরা মনে করেছেন।

কোনো দেশের শক্তি কখনো আবেগের উচ্চতায় বা মিথ্যা ভাষণে পরিমাপ করা যায় না। একটি দেশের প্রকৃত শক্তি নির্ভর করে তার অর্থনীতি, কূটনৈতিক প্রভাব, সামরিক প্রস্তুতি, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং জাতীয় ঐক্যের উপর। এই বিবেচনায় ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ভারতের দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক নীতির অংশও বটে। উদ্বেগের আরেকটি কারণ হলো, বাংলাদেশের রাজনীতিতে মজহবি উগ্রতার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা— এ নিয়ে বিভিন্ন পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকের মধ্যে আলোচনা রয়েছে। উগ্র মতাদর্শ যখন সমাজে প্রভাব বিস্তার করে, তখন তার প্রথম আঘাত নেমে আসে সংখ্যালঘু সমাজের উপর, ভিন্নমতাবলম্বী এবং মুক্তিচিন্তার মানুষের উপর। ইতিহাসের বহু উদাহরণ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, উগ্রবাদ শেষপর্যন্ত কাউকেই রেহাই দেয় না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা, উপাসনালয়ের সুরক্ষা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে। এসব ঘটনার যথাযথ তদন্ত, বিচার ও প্রতিকার নিশ্চিত করা একটি গণতান্ত্রিক দেশের সরকারের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এনিয়ে কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি। একইভাবে সংখ্যাগুরু কিংবা সংখ্যালঘু— যে কোনো সমাজের বিরুদ্ধে সহিংসতা সমানভাবে নিন্দনীয়।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, তার সঙ্গে সম্পর্কের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে নানামুখী আলোচনা রয়েছে। ইতিহাসের স্মৃতি, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং ভূ- রাজনৈতিক পরিদৃশ্যের আলোকে এসব প্রশ্নকে সংবেদনশীলতা ও সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে যে ভুল কৌশল, উগ্র আবেগ এবং স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত অনেক সময় একটি জাতিকে দীর্ঘমেয়াদি সংকটের দিকে ঠেলে দিতে পারে। উগ্রবাদ কখনো কোনো দেশের উন্নয়নের সোপান হতে পারে না। যেখানে জ্ঞানচর্চার পরিবর্তে অন্ধ আনুগত্য, যুক্তির পরিবর্তে উন্মাদনা এবং মানবিকতার পরিবর্তে ঘৃণার রাজনীতি স্থান পায়, সেখানে বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়ে। সভ্যতার অগ্রযাত্রা তখন থমকে যায়। ভারত বরাবরই ধৈর্য, সংযম ও কূটনৈতিক ভারসাম্যের নীতি অনুসরণ করে এসেছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নের পথকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছে। তবে প্রতিটি সার্বভৌম দেশের মতো সীমান্ত নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থ এবং প্রতিবেশী দেশের নাগরিকদের সুরক্ষার প্রশ্নে ভারতেরও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার রয়েছে।

শান্তির আকাঙ্ক্ষা দুর্বলতার প্রতীক নয়। বরং প্রকৃত শক্তিধর দেশই তার মূল্য বোঝে এবং সংযম প্রদর্শন করে। কিন্তু সেই সংযমকে যদি দুর্বলতা মনে করা হয়, তবে তা ভুল হিসেবের জন্ম দিতে পারে। ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে, অহংকার ও উগ্রতার মাশুল শেষপর্যন্ত অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যৎ শুধু যুদ্ধের রাজনীতিতে নয়, বরং সহযোগিতা, অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব এবং মানবিক সহাবস্থানের মধ্যেই নিহিত। সীমান্তের দুই পাশে কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন, জীবিকা ও ভবিষ্যৎ একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাই ঘৃণার রাজনীতি নয়, প্রয়োজন আস্থা ও সংলাপের সংস্কৃতি আবশ্যক। এর মধ্যে ইসলামপন্থী দলের হিন্দুদের গণহত্যার হুমকি এলেও যতো বড়ো মুখ নয় ততবড়ো কথা ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। ইতিহাস শেষপর্যন্ত তাদেরই মনে রাখে, যারা সেতু নির্মাণ করে।

যারা ঘৃণার প্রচীর তোলে, সময়ের নির্মম স্রোত একদিন তাদেরকেই ইতিহাসের প্রান্তরে একা ফেলে রেখে যায়। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। □

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ পর্যটনের রূপরেখা

সম্ভাবনা, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ দিশা

ড. নীলাঞ্জন রায়

ভারতবর্ষের পর্যটন শিল্প বর্তমানে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক পর্যটনের ধারণা এখন আর কেবল ঐতিহাসিক নিদর্শন বা দর্শনীয় স্থান ও নগরকেন্দ্রিক ভ্রমণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; পর্যটকরা ক্রমশ গ্রামীণ জীবনযাত্রা, লোকসংস্কৃতি, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, পরিবেশ ও ঐতিহ্যবাহী জীবনধারার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এই প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ পর্যটন (Rural Tourism) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প পর্যটন মডেল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, যার প্রায় ৬৮ শতাংশ মানুষ গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাস করেন, গ্রামীণ পর্যটন বিকাশের জন্য অত্যন্ত উপযোগী একটি রাজ্য।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে রয়েছে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, লোকশিল্প, কৃষিভিত্তিক জীবনধারা, বনাঞ্চল, নদী, পাহাড় ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল। ফলে গ্রামীণ পর্যটন শুধু পর্যটন শিল্পের বিকাশই নয়, স্থানীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

গ্রামীণ পর্যটন বলতে এমন পর্যটন ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে পর্যটকরা গ্রামীণ পরিবেশে অবস্থান করে স্থানীয় জীবনধারা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, কৃষিকাজ, হস্তশিল্প এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এটি মূলত জনগোষ্ঠী-আধারিত (community-based) পর্যটনের একটি রূপ, যেখানে স্থানীয় জনগণ সরাসরি পর্যটন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং আর্থিক সুবিধা লাভ করে।

গ্রামীণ পর্যটনের মূল উপাদানসমূহ হলো— (১) স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। (২) লোকশিল্প ও হস্তশিল্প। (৩) কৃষিভিত্তিক জীবনধারা। (৪) স্থানীয় খাদ্যসংস্কৃতি। (৫) প্রাকৃতিক পরিবেশ। (৬) স্থানীয়দের অংশগ্রহণ।

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে পর্যটকদের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ১০ কোটিরও বেশি এবং বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষের কাছাকাছি ছিল। যদিও এই পর্যটকদের অধিকাংশই কলকাতা, দার্জিলিং, দীঘা ও সুন্দরবনের মতো জনপ্রিয় গন্তব্যস্থলে ভ্রমণ করেন, তবুও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে গ্রামীণ পর্যটনের প্রতি আগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশেষত শান্তিনিকেতন, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং সুন্দরবন অঞ্চলের গ্রামগুলি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ পর্যটনের প্রধান কেন্দ্রসমূহ :

(১) শান্তিনিকেতন ও সুরুল (বীরভূম) : শান্তিনিকেতন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শে গড়ে ওঠা একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এখানকার গ্রামীণ পরিবেশ, বাউল সংস্কৃতি, হস্তশিল্প এবং সোনাঝুড়ি হাট পর্যটকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। **বিশেষ আকর্ষণ :** বাউল গান, ডোকরা শিল্প, চামড়া ও বাটিক শিল্প, পৌষমেলা ও বসন্ত উৎসব। **(২) পুরুলিয়ার**

গ্রামীণ পর্যটন : পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সম্ভাবনাময় গ্রামীণ পর্যটন অঞ্চল। এখানকার পাহাড়, বনাঞ্চল ও জনজাতি সংস্কৃতি পর্যটকদের জন্য অনন্য অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে।

বিশেষ আকর্ষণ : অযোধ্যা পাহাড়, চড়িদা গ্রামের ছৌ মুখোশ শিল্প, তুর্গা জলপ্রপাত, জনজাতি নৃত্য ও সংস্কৃতি। চড়িদা গ্রামকে 'মুখোশ গ্রাম' নামে অভিহিত এবং শতাধিক পরিবার ছৌ নৃত্যের মুখোশ তৈরির সঙ্গে যুক্ত। **(৩) বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও পঞ্চমুড়া :** বাঁকুড়ার গ্রামীণ ঐতিহ্য ও শিল্পকলার সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে।

বিশেষ আকর্ষণ : টেরাকোটা মন্দির, পাঁচমুড়ার বিখ্যাত টেরাকোটা ঘোড়া, বালুচরি শাড়ি, লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য। টেরাকোটা শিল্প বর্তমানে দেশ-বিদেশে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অন্যতম প্রতীক। **(৪) পিংলা (পশ্চিম মেদিনীপুর) :** পিংলার নয়াগ্রাম আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত পটচিত্র শিল্পের জন্য। এছাড়া সবং ও পিংলার মাদুর শিল্প গ্রামীণ অর্থনীতিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

বিশেষ আকর্ষণ : পটচিত্র, পটুয়া সঙ্গীত, শিল্পগ্রাম, হোমস্টে পর্যটন। প্রতি বছর 'পটমায়া' উৎসব দেশ-বিদেশের বহু পর্যটককে আকর্ষণ করে। **(৫) সুন্দরবন অঞ্চলের গ্রামীণ পর্যটন :** 'সুন্দরবন' বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি এবং ইউনেস্কো-স্বীকৃত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বা বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান। **বিশেষ আকর্ষণ :** ম্যানগ্রোভ বন, মৎস্যচাষিদের গ্রামীণ জীবন, বনবিবির সংস্কৃতি, নৌভ্রমণ। স্থানীয় জনগোষ্ঠী-আধারিত পর্যটনের মাধ্যমে সুন্দরবনবাসীদের আয়ের নতুন উৎস সৃষ্টি হয়েছে।

(৬) ঝাড়গ্রাম ও বেলপাহাড়ি : ঝাড়গ্রামের বনাঞ্চল ও জনজাতি সংস্কৃতি গ্রামীণ পর্যটনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। **বিশেষ আকর্ষণ :** কাঁকড়াঝোড়, বেলপাহাড়ি, জনজাতি হস্তশিল্প, জঙ্গলভিত্তিক পর্যটন।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ পর্যটনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব : গ্রামীণ পর্যটন স্থানীয় অর্থনীতিকে বহুমাত্রিকভাবে শক্তিশালী করে।

ক্ষেত্র	প্রভাব
কর্মসংস্থান	স্থানীয় যুবকদের জন্য চাকরির সুযোগ
হস্তশিল্প	পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ
কৃষি	কৃষিভিত্তিক পর্যটন ও জৈব কৃষির প্রসার
নারী ক্ষমতায়ন	স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি
ক্ষুদ্র উদ্যোগ	হোমস্টে, খাদ্য ও পরিবহণ ব্যবসা

বিশ্ব পর্যটন সংস্থার মতে, পর্যটন খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং গ্রামীণ অঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাসে পর্যটন শিল্প একটি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ পর্যটনের SWOT বিশ্লেষণ :

শক্তি ঃ সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতি, বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক পরিবেশ, ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প, অতিথিপরায়ণ স্থানীয় জনগণ।

দুর্বলতা ঃ অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, পর্যাপ্ত প্রচারের অভাব, দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি।

সুযোগ ঃ বিদেশি পর্যটকদের আগ্রহ বৃদ্ধি, ডিজিটাল বিপণন, হোমস্টে উন্নয়ন, ইকো-ট্যুরিজম ও অ্যাগ্রো-ট্যুরিজম।

সমস্যা ঃ পরিবেশ দূষণ, অতিরিক্ত বাণিজ্যিকীকরণ, সাংস্কৃতিক বিকৃতি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান— (১) পর্যাপ্ত রাস্তা ও পরিবহণ সুবিধার অভাব। (২) বসবাসের উপযোগী ও গুণমানসম্পন্ন আবাসন ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা। (৩) ডিজিটাল বিপণনের অভাব। (৪) স্থানীয় জনগণের পর্যটন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ঘাটতি। (৫) পর্যটন স্থানের সঠিক ব্র্যান্ডিঙের অভাব। (৬) পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতার অভাব।

সুষম গ্রামীণ পর্যটনের কৌশল ঃ

(১) হোমস্টে মডেলের সম্প্রসারণ ঃ স্থানীয় পরিবারভিত্তিক আবাসন পর্যটকদের বাস্তব গ্রামীণ অভিজ্ঞতা প্রদান করবে এবং স্থানীয় আয় বৃদ্ধি করবে। **(২) ডিজিটাল প্রচার ঃ** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ওয়েবসাইট এবং অনলাইন বুকিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গ্রামীণ গন্তব্যগুলিকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করা প্রয়োজন। **(৩) দক্ষতা উন্নয়ন ঃ** স্থানীয় যুবক-যুবতীদের গাইডের প্রশিক্ষণ, আতিথেয়তা ব্যবস্থাপনা এবং ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত। **(৪) শিল্প ও সংস্কৃতিভিত্তিক পর্যটন ঃ** পিংলার পটচিত্র, চারিদার ছৌ মুখোশ, পঞ্চমুড়ার টেরাকোটা শিল্পকে কেন্দ্র করে পর্যটন প্যাকেজ তৈরি করা যেতে পারে। **(৫) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ঃ** পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং বিপণনে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন। **(৬) পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ** পর্যটন উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

জাতীয় শিক্ষা নীতি, 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' উদ্যোগ এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক পর্যটনের (Experiential Tourism) ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ পর্যটনের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। আন্তর্জাতিক পর্যটকদের মধ্যে স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং গ্রামীণ জীবনধারার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন গন্তব্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। বিশেষত পিংলার পটচিত্র, পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য, বাঁকুড়ার ঐতিহ্যবাহী টেরাকোটা শিল্প, বীরভূমের বাউল পরম্পরা ও সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করে সমন্বিত পর্যটন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের 'গ্রামীণ পর্যটন' পরিকল্পনা কেবল একটি পর্যটন শিল্প কর্মসূচি নয়; এটি গ্রামীণ উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ এবং স্থানীয়দের অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির একটি কার্যকর মাধ্যম। রাজ্যের সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতি, ঐতিহ্যবাহী শিল্প, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং মানবসম্পদ— গ্রামীণ পর্যটনের বিকাশে শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে। যথাযথ পরিকল্পনা, পরিকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাল বিপণন, বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সুষম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে 'পশ্চিমবঙ্গ' ভারতের অন্যতম প্রধান গ্রামীণ পর্যটন গন্তব্যে পরিণত হতে পারে।

এর ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত হবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিশ্বদরবারে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

(লেখক জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

মিড-ডে মিলে ইস্কনের অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত সঠিক

খাদ্য নিয়ে জার্মান দার্শনিক লুডভিগ ফয়ারবাখের একটি উক্তি বেশ প্রণিধানযোগ্য— 'ম্যান ইজ, হোয়াট হি ইটস।' মানুষ যা খায়, সে তাই। অর্থাৎ মানুষ তাঁর আহারেই প্রতিফলিত হয়। ফয়ারবাখ তাঁর এই উক্তির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে তার খাদ্যের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের চিন্তা, শক্তি ও জীবনযাত্রা অনেকাংশে তার পুষ্টি ও আহারের ওপর নির্ভরশীল। ভারতীয় দর্শনেও এর অনুরণন দেখা যায়। উপনিষদ ও গীতার ভাষ্য অনুযায়ী, খাদ্য তিন প্রকারের। যথা— সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক খাদ্য মানুষের আয়ু, বল, স্বাস্থ্য, সুখ ও প্রীতি বৃদ্ধি করে। সবমিলিয়ে খাদ্য মানুষের স্বভাব ও মানসিকতার ওপর প্রভাব ফেলে। উপরন্তু শুদ্ধ আহার কেবল শরীরের পুষ্টির জন্য নয়, মন ও চেতনার পবিত্রতার জন্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই ফয়ারবাখের উক্তি এবং ভারতীয় ভাবনা যথা— 'যেমন আহার, তেমন আচরণ'-এর মধ্যে একটি আকর্ষণীয় সাদৃশ্য বর্তমান।

সর্বোপরি, খাদ্য কেবল ক্ষুধা নিবারণের উপকরণ নয়। খাদ্য শরীরের ভাষাও বটে। খাদ্যের ঔষধিগুণও থাকে। সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য অনেক রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এই ভাবনা থেকেই 'লেট ফুড বি থাই মেডিসিন'-এর মতো বহুল প্রচলিত ধারণার জন্ম হয়েছে। সেই হিসেবে সুস্থ ও সবল থাকতে শরীরের জন্য প্রয়োজন এমন খাদ্য নির্বাচিত হওয়াই শ্রেয়। পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ শিশু-কিশোরের যে বর্তমান খাদ্যাভ্যাস গড়ে উঠেছে, তা তাদের ভৌগোলিক পরিবেশ, পারিবারিক পরিবেশ, সংস্কৃতি, স্বাদ, গন্ধ, মানসিক অবস্থা এই সহজলভ্যতার ওপর নির্ভর করে। যে খাদ্যাভ্যাস সর্বত্র 'লেট ফুড বি থাই মেডিসিন' ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে গড়ে উঠেছে— এমনটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। সেই হিসেবে মিড-ডে মিলে ইস্কনের অন্তর্ভুক্তির ফলে শিক্ষার্থীদের যদি অন্তত একবেলা সাত্ত্বিক খাবার পরিবেশ করা যায়, তাতে মন্দ কী! মনে রাখতে হবে, সাত্ত্বিক আহার শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখে, মনকে শান্ত ও সংযত রাখে, সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটায়, আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সহায়ক হয়, ইন্দ্রিয়সংযমে সাহায্য করে, লেখাপড়ায় মনোসংযোগ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আর এই সবকিছুর বিনিময়ে উন্নত জাতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

ফঃ ৩

—অজয় ভট্টাচার্য,
বনগাঁ, উ: ২৪ পরগনা।

ভারতবর্ষকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় কারা?

এই প্রশ্নের এক-কথায় উত্তর হতে পারে--- এক শ্রেণীর হিন্দু পদবিধারী সেকুলার, বাম ও অতিবাম হিন্দু-বিদ্বেষীরা। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার সেকুলারদের নেতা হবার মানসে প্রকাশ্যে মিডিয়ার সামনে পরস্পর পরস্পরকে সদম্ভে গোমাংস ভক্ষণ করিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে এটাই বলতে চান যে, 'হে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যাক-ডেটেড হিন্দু সমাজ, দেখো--- আমরা কতবড়ো প্রগতিশীল, আমরা একজন কলকাতার প্রাক্তন মহানাগরিক তথা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার আর অপরজন স্বনামধন্য কবি হয়েও পরস্পর পরস্পরকে কেমন অবলীলাক্রমে গোমাংস খাইয়ে দিচ্ছি, আর তোমরা ব্যাকডেটেড গোড়া ধার্মিকদের কথায় এখনো কত পিছিয়ে আছো।'

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, এই বিষয়ে কোনো হিন্দু বা কোনো আধ্যাত্মিক সংস্থার পক্ষ থেকে 'টু-শব্দটি' করতে শোনা যায়নি। কেন শোনা যায়নি? কারণ আমরা হিন্দু সমাজ শুধু সহনশীল নই; আপন ধর্ম সম্বন্ধেও বড়োই উদাসীন। আর একইভাবে কোনো মুসলমান যদি কোনো মুসলমানকে শুয়োরের মাংস খাইয়ে দিতেন— তাহলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাদের দেহের সামান্যতম অংশও খুঁজে পাওয়া যেতো কি?

বর্তমান বিশ্বে খ্রিস্টান দেশের সংখ্যা প্রায় ১৫০টি, মুসলমান দেশের সংখ্যা ৫৩টি, ইহুদি দেশের সংখ্যা মাত্র একটি--- ইজরায়েল। আর হিন্দু দেশের সংখ্যা— 'নৈব-নৈবচ'। অথচ প্রায় ৭৮ শতাংশ হিন্দু জনসংখ্যা বিশিষ্ট ভারত-ভূমিকে হিন্দু রাষ্ট্রের তকমা দেবার কথা উঠলে সর্বপ্রথম জ্বলন ধরে উল্লিখিত হিন্দু কুলোদ্ভব হিন্দু-বিদ্বেষীদের। তাই এই সব হিন্দু- বিদ্বেষীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের সময় এসেছে।

বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের জনবিন্যাস কিন্তু দ্রুত বদলে যাচ্ছে। হাদিসের ভাষ্যানুসারে মুসলমান পুরুষেরা জনপ্রতি ৪ জন নারীকে বিবাহ বা নিকাহ করতে পারে। আর হিন্দুরা 'ওনলি ওয়ান।' ওঁদের বিবিরা যদি প্রত্যেকে গড়ে ২টি সন্তানের জন্ম দেন, তাহলে দম্পতি পিছু সন্তানের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ জন। আর তথাকথিত প্রগতিশীল হিন্দুরা 'শান্তির নীড়' গড়বার স্বপ্নে বিভোর হয়ে দম্পতি পিছু 'সিঙ্গেল চাইল্ড' গ্রহণের নীতিতে অবিচল। জেহাদি মুসলমানদের ভায্যানুসারে ভারত এখন 'দার-উল-হারব'। তাই যত দ্রুত সম্ভব বংশবিস্তার দ্বারা ভারতকে 'দার-উল-ইসলাম' করতেই হবে। অতএব সাধু সাবধান! এইভাবে চলতে থাকলে মাত্র ১৫ থেকে ২০ বছরই যথেষ্ট। ভারতভূমিকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণার কথা উঠলে ভারতীয় মুসলমানরা ব্যথিত হবেন বটে, তবে তেমন 'হালে পানি' পাবেন না। তার কারণ খণ্ডিত ভারতভূমি থেকে সৃষ্ট পশ্চিমে পাকিস্তান আর আগে বাংলাদেশকে ইসলামিক দেশ ঘোষণা মোটেই কালক্ষেপ করেনি। তাই হিন্দুনাম-পদবিধারী সেকুলার, বাম ও অতিবামদের বুকে যতই জ্বলন ধরুক— আমাদের অতি সত্বর চাই 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি।

—বিনয় কৃষ্ণ দাশ,
বালুরঘাট, দ: দিনাজপুর।

পেট্রাপোলে জিএসটি প্রতারণা

ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত বনগাঁ-পেট্রাপোল আন্তর্জাতিক সীমান্ত। অথচ সেই সীমান্তেই বিদেশি নাগরিকদের সঙ্গে চলছে একের পর এক আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ। টাকা ভাঙানোর নামে কিছু মানি এক্সচেঞ্জ কাউন্টার এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত দালালচক্রের বিরুদ্ধে উঠেছে গুরুতর অভিযোগ। প্রশ্ন উঠছে— এ কি বৈধ ব্যবসা, নাকি দিনের আলোয় চলা সংগঠিত লুট?

অভিযোগ অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে আগত যাত্রীদের একটি অংশকে পরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট কয়েকটি কাউন্টারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে প্রথমে বেশি বিনিময় মূল্যের লোভ দেখানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, বাজারে যেখানে বাংলাদেশি টাকার মূল্য ৭২ টাকা, সেখানে ৭৪ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হবে। কিন্তু আসল খেলা শুরু হচ্ছে হিসেবের সময়। গ্রাহকদের কাছ থেকে 'জিএসটি'র নামে সরাসরি ৯ শতাংশ টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে প্রায় ৯ হাজার টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয়, এই বিপুল অঙ্কের টাকা কেটে নেওয়ার পরও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাহকদের হাতে কোনো বৈধ জিএসটি রসিদ তুলে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

প্রশ্ন উঠছে, যদি সত্যিই জিএসটি কাটা হয়, তাহলে তার সরকারি রসিদ কোথায়? সেই অর্থ সরকারের কোষাগারে জমা পড়ছে তো? নাকি 'জিএসটি' শুধুই একটি মুখোশ, যার আড়ালে চলছে সাধারণ মানুষ ও বিদেশি নাগরিকদের পকেট কাটা? স্থানীয় সূত্রের দাবি, এই গোটা ব্যবস্থার নেপথ্যে রয়েছে একটি সুসংগঠিত সিন্ডিকেট। বাজারে প্রচলিত অভিযোগ অনুযায়ী, 'হুলিয়া নাথ' (নাম পরিবর্তিত) নামে এক প্রভাবশালী ব্যক্তি তার রাজনৈতিক যোগাযোগ ও প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে এই চক্রের অন্যতম নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করছে। যদিও এই অভিযোগের সরকারি বা স্বাধীন যাচাই এখনও হয়নি, তবুও সীমান্ত এলাকায় বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

সাধারণ মানুষের বক্তব্য, পেট্রাপোল সীমান্তে প্রতিদিন হাজার হাজার বিদেশি নাগরিক যাতায়াত করেন। তারা যদি ভারতের মাটিতে পা রেখেই প্রতারণার শিকার হন, তাহলে তা শুধু আর্থিক অপরাধ নয়, দেশের সম্মান ও ভাবমূর্তির উপরও সরাসরি আঘাত। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে আয়কর বিভাগ, জিএসটি কর্তৃপক্ষ, এনফোর্সমেন্ট সংস্থা এবং প্রশাসনের যৌথ তদন্ত হওয়া উচিত। সংশ্লিষ্ট কাউন্টারগুলির হিসেবপত্র, জিএসটি জমার নথি, লেন-দেনের রেকর্ড এবং দালালচক্রের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হোক। কারা এই অবৈধ অর্থের সুবিধাভোগী, কার ছত্রছায়ায় চলছে এই কারবার— সেই সত্য সামনে আসুক। ব্যবসা হোক, কিন্তু আইন মেনে। কর নেওয়া হোক, কিন্তু রসিদ দিয়ে। বিদেশি নাগরিকদের ঠকিয়ে নয়, স্বচ্ছতার সঙ্গে।

আজ সীমান্তবাসীর প্রশ্ন, ৯ শতাংশ জিএসটির নামে যে টাকা কাটা হচ্ছে, সেই টাকা যাচ্ছে কোথায়? কারা এই সিন্ডিকেটের আসল মাথা? আর কতদিন দেশের প্রবেশদ্বারে চলবে এই অভিযোগের কালো ব্যবসা? পেট্রাপোলকে প্রতারণার আখড়া নয়, স্বচ্ছ ও সৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে অবিলম্বে কঠোর তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

—**কুন্তল চক্রবর্তী**

কলেজ রোড, বনগাঁ উ: ২৪ পরগনা।

পরিবর্তনের ছোঁয়া

রাজ্যে পালা বদল। জনগণ তাই চাইছিল। পরিবর্তনের পরিবর্তন ভালো লাগার কথা। তবু যেন গলায় কাঁটা ফোটার মতো মনে খচখচ করছে। গণতন্ত্র প্রোটোকল-বিরোধী কাজকর্ম শিষ্টাচার নয়। জনগণের কাছে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। মনে রাখা দরকার, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন অগ্নিকন্যার রূপ ধারণ করে বেহালা থানায় গিয়ে ওসির চেয়ারে বসতে গিয়েছিলেন, তৎকালীন ওসি অপমানিত বোধ করেছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বাড়িতে যে পুলিশ ডিউটি করতেন, তিনি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মেয়ে সুচরিতাকে স্যালুট জানাননি বলে চাকরি যায়। ক্যানিং থেকে আসা সেই সাব-ইনস্পেক্টরের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। প্রোটোকল-বিরোধী কাজ করেননি বলে চাকরি খোয়াতে হয়েছিল। বর্তমান সরকারের জনপ্রতিনিধিদেরও মনে রাখতে হবে, পরিবর্তনের পরিবর্তনের ছোঁয়ায় সংক্রমিত হওয়া চলবে না। আমাদের শেষ প্রদীপ, অনেক আশা-ভরসা করে পশ্চিমবঙ্গকে জেহাদিদের হাত থেকে রক্ষা করা গিয়েছে। জেহাদি কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরাদ হাকিম তপন-শুকুরদের মতো কখনো বিজেপির সম্পদ হয়ে উঠতে পারে না। তপন ও শুকুর আলি ছিল সিপিএমের জল্লাদ বাহিনী। সিপিএম তাদেরকে তাদের দলের সম্পদ করে রেখেছিল। বিজেপির নেতা-নেত্রীদের মনে রাখা দরকার, আপামর জনগণ বিজেপির আসল সৈনিক। এই জেহাদি হিন্দু-বিদ্বেষীদের দলে নেওয়া মানে এক বালতি দুধে এক ফোঁটা গোমূত্র ফেলে দেওয়া। জনগণ যাকে ঘৃণা করতে ভালোবাসে, এখন জনগণ কীভাবে তাকে নেবে, এটা বিজেপি নেতৃত্বকে বুঝতে হবে। জনগণের ভাষা বুঝতে অক্ষম হলে অনেক সমস্যায় পড়তে হবে।

হকার উচ্ছেদ চাই। রেলের যাত্রীদের যন্ত্রণা দিয়ে যুগ যুগ ধরে তারা স্টেশন জবরদখল করে থাকতে পারে না। রেলের জায়গা, রেলের জল, রেলের বিদ্যুৎ অবৈধভাবে ব্যবহার করে। অবৈধ কখনো বৈধকরণ হয় না। স্টেশনে স্টেশনে হকার মানে জবরদখল, মস্তান বাহিনী। হকারদের মাসিক দিতে হয় মস্তানদের। তোলাবাজি বন্ধ হোক। প্রশাসন কঠোর হলে জনগণ মুক্তি পায়। পনেরো বছর তৃণমূল শাসনে কোনো থানায় একটাও জিডি এন্ট্রি লজ করা যায়নি। থানাগুলোকে মনে হয়েছিল মস্তানদের পার্টি অফিস। আবার মুসলমান হলে কোনো আইন লাগু হয় না। কী নৈরাজ্যের মধ্যে রাজ্য ছিল।

জঞ্জালমুক্ত কলকাতা চাই। হকারমুক্ত স্টেশন চাই। হকারমুক্ত কলকাতার ফুটপাত চাই। সরকার জনগণকে সোনার পশ্চিমবঙ্গ উপহার দেবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, পালন করুক। তিলোত্তমা একটা শহরের নাম, রূপসী বাংলা একটা রাজ্যের নাম, এই নামে পরিচিতি হোক আমাদের রাজ্যের। স্বচ্ছ, উন্নয়নশীল, গতিশীল প্রশাসনের যে স্বপ্ন জনগণকে দেখানো হয়েছিল, তা বাস্তবায়ন হোক ডাবল ইঞ্জিন সরকারের মাধ্যমে।

—**সুবল সরদার**, মগরাহাট, দ: ২৪ পরগনা।

খ্রিস্টান মিশনারিদের ফাঁদ এবং সচেতন মাতৃশক্তি

সুতপা বসাক ভড়

বর্তমানে পৃথিবীর কয়েকটি মতবাদ ভারতে প্রচারের আলোয় আসার চেষ্টা করছে। সেগুলি কতটা ঠিক এবং আদৌ প্রাসঙ্গিক কিনা, সে বিষয়েও উঠছে প্রশ্ন। সত্যতার নিরিখে বিচার হচ্ছে বিভিন্ন মতের। এগুলির মধ্যে অন্যতম হলো খ্রিস্ট মতবাদ। সেটি দীর্ঘসময় ধরে সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভদ্র ব্যবহারের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদকেই প্রাধান্য দিয়ে চলেছে। যেকোনো দেশ নিজেদের অধিকারে আনার জন্য প্রথমে তারা পাঠায় ক্রুশ, বাইবেল ও মিশনারি। ভগিনী নিবেদিতা একাধিকবার এদের সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করেছেন। ইতিহাস সাক্ষী, যেখানেই খ্রিস্টানরা গেছে, সেখানকার নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া রেড-ইন্ডিয়ানরা একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া মহাদেশে ঘটেছে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। যে দেশগুলি স্বাধীন ছিল, তারাও নিজস্ব সংস্কৃতি জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়েছে।

আমাদের দেশে অনেকের বাড়িতে যিশুর ছবি থাকে। অনেকে সন্তানদের কনভেন্ট স্কুলে পড়িয়ে গৌরববোধ করে। ওই স্কুলগুলির পড়াশোনার মান ও শৃঙ্খলার প্রশংসা করা হয়। মিশনারিজ অব চ্যারিটি, সিস্টারস্ অব চ্যারিটির মতো সংস্থাগুলি শিক্ষাক্ষেত্র এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। এদের স্কুলের অভ্যন্তরে ঢুকলে মনে হবে, এটি যেন ভারতের বাইরের কোনো সংস্থান। সর্বত্র যিশু-মেরি-জর্ডনের জল-গির্জা-প্রার্থনা-কনভেন্টের প্রভাব। শিক্ষক- শিক্ষিকারা খ্রিস্টান অথবা ক্রিপ্টো খ্রিস্টান। বাকি কর্মচারীরা প্রত্যেকে খ্রিস্টান। ব্যবসায়িক লেন-দেন সব খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে। স্কুলে ভারতীয় সংস্কৃতির চিহ্নমাত্র নেই। বিদ্যার পীঠস্থানে মা সরস্বতীর পূজা নিষিদ্ধ। সেখানে খ্রিস্টমতে প্রার্থনা হয়, অবহেলা করা হয় ভারতীয় সংস্কৃতিকে। তিলে তিলে চলতে থাকে বিদ্যার্থীদের'মগজ ধোলাই'। একটু নামকরা স্কুলে কোনোরকম প্রতিযোগিতা ছাড়াই খ্রিস্টান ছাত্র-ছাত্রীরা সুযোগ পেয়ে যায়। কেবলমাত্র স্কুলেই সীমাবদ্ধ নয়, সংশ্লিষ্ট লোকালয়েও ওদের প্রভাব থাকে। কোনো কোনো স্থানে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা চোখে পড়ার মতো। বাহ্যিক আকর্ষণে তারা সমাজকে প্রভাবিত করে। ভারতীয় সংস্কৃতিকে অবহেলা করে। এরপর হয় ধর্মান্তরণ। খ্রিস্টানরা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে বাড়ে বিচ্ছিন্নতা ও সন্ত্রাস।

উদাহরণ স্বরূপ— ত্রিপুরা, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল, মণিপুর ইত্যাদি। বিদেশ থেকে আসা কোটি কোটি ডলার ওরা সেবা, চিকিৎসার নামে ব্যয় করে। অনেক রাজনৈতিক নেতারাও তার অংশ পায়। সাহিত্য, সিনেমা, নাটক, সংবাদপত্র ইত্যাদি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমেও তারা অর্থ দিয়ে থাকে। আমাদের রাজ্যেও কলকাতা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি জেলায় ওরা জাল বিস্তার করে ফেলেছে। গ্রাম-বনাঞ্চলে দরিদ্র হিন্দুদের খাদ্য-বস্ত্রের, কাজের লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করে। নাম পরিবর্তন করে। সিনেমাতে খ্রিস্টান ফাদার, মাদার, সিস্টারদের যেন-তেন-প্রকারেণ মহিমান্বিত করে দেখানো হয়ে থাকে। ইংরেজ শাসনকালে যত মিশনারি এসেছিল, তার থেকে অনেক গুণ বেশি মিশনারিরা এখন সমগ্র ভারতে নানাভাবে ধর্মান্তরণের কাজ করে চলেছে। তারা কোনো মুসলমান দেশে যাওয়ার সাহস দেখায় না। ওরা ভারতে এসে, সেবার নামে ধর্মান্তর, গোত্রান্তর, রাষ্ট্রদ্রোহ, বিচ্ছিন্নবাদের মতো অপরাধ করে চলেছে। হাজার হাজার হিন্দুকে ত্রিপুরার উপজাতি খ্রিস্টানরা হত্যা করেছে। AWAKE পত্রিকার মতে খ্রিস্টানদের পারিবারিক জীবন ভেঙে পড়ছে। তাদের মধ্যে অবিশ্বাস, বিবাহ-বিচ্ছেদ, যৌন ব্যভিচার, মানসিক ব্যাধি, অপরাধ প্রবণতা বেড়ে চলেছে। অবৈধ সন্তানে ভরে যাচ্ছে খ্রিস্টান দুনিয়া। অথচ, আমাদের উদার মানসিকতার জন্য অনেকেই বলেন যে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের মতো বিপজ্জনক নয়। তাদের এবার সচেতন হবার সময় হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় ওরা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। বাড়ির সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব মায়েরা নিয়ে থাকেন। সেজন্য ভালো সরকারি স্কুল, ভারতীয় সংস্কৃতি মেনে চলে এমন অনেক ভালো প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে সন্তানদের ভর্তি করানো যেতে পারে। এখানে আমরা আমাদের জ্ঞান পরম্পরা বজায় রেখে সন্তানদের শিক্ষা দান করতে পারি। ফলে ধর্মবোধ থাকবে বিদ্যার্থী জীবনেও। আগামী প্রজন্ম অংশগ্রহণ করবে বৈভবশালী রাষ্ট্র গঠনে, সেখানে ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ সকলেরই হবে চূড়ান্ত উন্নতি।

আমরা লাভ-জেহাদ সম্পর্কে সচেতন, অথচ খ্রিস্টানরা হিন্দু এলাকায় প্রেমবিবাহ, ধর্মান্তরণ, গির্জা, কবরখানার মাধ্যমে 'ডেমোগ্রাফি' পরিবর্তন করে চলেছে। ওদের প্রতিষ্ঠানে একনিষ্ঠ হিন্দুদের কোনো স্থান নেই। সুদীর্ঘ ছাত্রজীবনে ছোটো থেকে কৈশোর মেরি-যিশু-বাইবেল-জর্ডন-গির্জার প্রভাব বিস্তার করা ও নিজ ধর্মকে অবহেলা করতে শেখায় ওরা। মায়েরা সন্তানদের রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, গীতা সম্পর্কে ছোটো থেকে অবগত করবেন— এমনটাই অভিপ্রেত। স্বাধ্যায়ের সার্থক প্রয়োগ করতে হবে মা-সন্তান উভয়কেই। এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার রচনা পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। আমরা সচেতন হব, এখনও সময় আছে। সচেতন মায়েরাই গড়ে তুলতে পারেন সশক্ত নতুন প্রজন্ম। □

ক্যানসার কি শুধুই মারণব্যাধি?

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

'ক্যানসার' এই শব্দটির সঙ্গে আমাদের সমাজে যেন 'মারণব্যাধি' শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ক্যানসারের নাম শুনলেই অধিকাংশ মানুষের মনে প্রথম যে ভাবনাটি আসে, তা হলো নিশ্চিত মৃত্যু। এই ভয় অমূলক নয়। দীর্ঘদিন ধরে দেখা গেছে, ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অল্প সংখ্যক মানুষই সম্পূর্ণ সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পেরেছেন। বিশেষত আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ও সচেতনতার অভাবে অনেক রোগী সময়মতো চিকিৎসা পান না। ফলে ক্যানসারকে আমরা আজও এক ভয়ংকর ও অনিবার্য রোগ হিসেবেই দেখি।

কিন্তু সত্যিই কি ক্যানসার মানেই মৃত্যু? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আগে বুঝতে হবে ক্যানসার আসলে কী?

সহজভাবে বললে, ক্যানসার হলো শরীরের কোষের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন বা বৃদ্ধি। আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষ নির্দিষ্ট নিয়মে জন্মায়, কাজ করে এবং নির্দিষ্ট সময় পরে নষ্ট হয়ে যায়। যেমন লাল রক্তকণিকার আয়ু প্রায় চার মাস, শ্বেত রক্তকণিকার আয়ু প্রায় এক বছর, আর কোলনের কোষের আয়ু মাত্র চার দিন। একমাত্র স্নায়ুকোষ ব্যতিক্রম এরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিত থাকে এবং সাধারণত বিভাজিত হয় না।

এই কোষ বিভাজন ও ধ্বংসের পুরো প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত হয় কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকা ডিএনএর দ্বারা। ডিএনএ-তে থাকা জিনগুলো ঠিক করে দেয় কখন কোষ বিভাজিত হবে, কখন থামবে এবং কখন কোষটি ধ্বংস হবে। এই কাজের জন্য মূলত তিন ধরনের জিন দায়ী :

১. Proto-oncogene যা কোষ বিভাজনের নির্দেশ দেয়।

২. Tumor suppressor জেনারেল যা কোষ বিভাজন বন্ধ করে।

৩. ডিএনএ জেনারেল যা ডিএনএ-এর ক্ষতি মেরামত করে।

যখন কোনো কারণে এই জিনগুলোর মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, তখনই ক্যানসারের সূচনা হয়। মানব ইতিহাসে ক্যানসার নতুন কোনো রোগ নয়। প্রায় ১৬০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দেই এই রোগের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রিক শব্দ Karkinos (কাঁকড়া) থেকেই 'ক্যানসার' শব্দটি উৎপত্তি বলে মনে করা হয়, কার্সিনোমা, সারকোমা, ব্লাস্টোমা এই শব্দগুলোর উৎসও গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা। জার্মান চিকিৎসাবিজ্ঞানী উইলহেলথ ক্যানসার নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেন এবং বলেন, জিনগত পরিবর্তনের মধ্যেই ক্যানসারে সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে থাকে।

সমাজে প্রায় ১০ শতাংশ ক্যানসার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জিনগত পরিবর্তনের কারণে হয়ে থাকে। তবে মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৩ শতাংশ মানুষই সরাসরি বংশগত ক্যানসার বহনকারী বলে মনে করা হয়। বাকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্যানসার হয় পরিবেশগত ও জীবনযাপনজনিত কারণে যেমন রাসায়নিক পদার্থ, প্রাকৃতিক বিষক্রিয়া, রেডিয়েশন, সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ইত্যাদি। এসব উপাদান ডিএনএ-কে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সাধারণত শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা এই ক্ষতি সারিয়ে তোলে, কিন্তু যখন সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়, তখন কোষ অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিভাজিত হতে শুরু করে এবং সেখান থেকেই জন্ম নেয় ক্যানসার কোষ।

ক্যানসার কোষ প্রথমে নিজের সংখ্যা বাড়ায়, পরে আশপাশের সুস্থ কোষ ধ্বংস করে জায়গা দখল করে টিউমার তৈরি করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে টিউমারের জন্য নতুন রক্তনালী তৈরি হয়, যা দিয়ে ক্যানসার কোষ রক্তপ্রবাহে ঢুকে শরীরের অন্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। একে বলা হয় মেটাসসটাসিস। সাধারণত যকৃত, ফুসফুস ও হাড়ে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের টিউমার বেশি দেখা যায়।

বর্তমানে তামাক, অ্যালকোহল, স্থুলতা ও শারীরিক, পরিশ্রমের অভাব প্রায় ৩৩ শতাংশ ক্যানসারের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। অনেকেই মনে করেন মোবাইল ফোনের বিকিরণ ক্যানসারের কারণ হতে পারে। যদিও এখনও পর্যন্ত মোবাইল ফোনের বিকিরণের সঙ্গে ক্যানসারের কোনো সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক প্রমাণিত হয়নি।

ক্যানসার শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কুকুর, বিড়াল-সহ বিভিন্ন প্রাণীর শরীরেও ক্যানসারের নমুনা শনাক্ত হয়েছে।

ক্যানসারের ধরনও ভিন্ন ভিন্ন। অ্যাডনোকার্সিনোমা এপিথেলিয়াল কোষ থেকে উৎপন্ন হয় স্তন, ফুসফুস, প্রোস্টেট ও অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার উল্লেখযোগ্য। সারকোমা হয় হাড়, পেশি ও চর্বি থেকে। লিউকেমিয়া ও লিম্ফোমা রক্ত ও লসিকা তন্ত্রের ক্যানসার। ব্লাস্টোমা সাধারণ শিশুদের ভ্রূণীয় টিসু থেকে তৈরি হয়।

বিশ্বব্যাপী ক্যানসারের প্রভাব ভয়াবহ। ২০১৮ সালে বিশ্ব জুড়ে প্রায় ১৮.১ মিলিয়ন নতুন ক্যানসার রোগী শনাক্ত হয় এবং প্রায় ৯.৬ মিলিয়ন মানুষ এই রোগে মারা যান। ক্যানসার চিকিৎসায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ বিপুল অর্থ ব্যয় করছে। তবুও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সচেতনতার অভাবে মৃত্যুহার বেশি।

সবশেষে প্রশ্ন আসে, ক্যানসার হলে কতদিন বাঁচা যায়? এর নির্দিষ্ট উত্তর নেই। ক্যানসারের ধরন, স্টেজ, রোগীর শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসার প্রতিক্রিয়ার উপর সব কিছু নির্ভর করে। তবে একটি কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যানসার ধরা পড়লে এবং সঠিক চিকিৎসা পেলে অনেক ক্ষেত্রেই এই রোগ জয় করা সম্ভব।

অতএব, ক্যানসার শুধুই মরণব্যাধি এই ধারণা এখন আর সম্পূর্ণ সত্য নয়। সচেতনতা, সময়মতো রোগ নির্ণয় এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই পারে ক্যানসারকে পরাজিত করতে। □

হরিদ্বারে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক মণ্ডলীর বৈঠক

গত ১৮-১৯ জুন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় মার্গদর্শকমণ্ডলীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় হরিদ্বারের ভূপৎবালা স্থিত নিষ্কাম সেবা ট্রাস্টের সভাগৃহে। প্রথমদিন দুপুর ৩টায় প্রদীপ প্রজ্বলন করে বৈঠকের শুভারম্ভ হয়। এদিন সভাপতিত্ব করেন নির্বাণ আখড়ার আচার্য মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিশোকানন্দজী মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন শ্রীসুধাংশু মহারাজ, আচার্য মহামণ্ডলেশ্বর কৈলাশানন্দজী মহারাজ প্রমুখ বিশিষ্ট সন্ত। সভার আলোচনার প্রথমে আন্তর্জাতিক সভাপতি আলোকজী সভার অলোচ্য বিষয় জ্ঞাপন করেন। এদিন মূলত গোরক্ষা বিষয়ে দেশব্যাপী জাগরণ এবং গোমাতার জাতীয় স্বীকৃতি সম্পর্কে জনমত সংগ্রহ বিষয়ে আলোচনা হয়।

পরদিন সকাল ৯ টায় প্রথম সত্রে সভাপতিত্ব করেন জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য জ্যোতিপীঠাধীশ্বর অনন্ত শ্রী ভূষিত স্বামী বাসুদেবানন্দ সরস্বতী মহারাজ। এই সত্রে দেশব্যাপী নেশামুক্তির জন্য জনজাগরণ কর্মসূচির পরিকল্পনা হয়। এদিনের দ্বিতীয় সত্রে উপস্থিত ছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিংহ ধামী। তিনি বলেন, সন্তদের আশীর্বাদে এই দেবভূমির সনাতন প্রবাহ রক্ষার জন্য যে সমস্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বা আগামীদিনে হবে তাতে তার সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে। এই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২৫ জন সন্ত-সহ ৭ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী গুরুপদানন্দজী, স্বামী ধর্মাত্মানন্দজী, শিলিগুড়ির শ্রীসজ্জন মহারাজ, মহানাম অঙ্গনের শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, রিষড়া প্রেমমন্দির আশ্রমের শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী, ইসকনের শ্রীজগদার্তিহা প্রভু, সাধ্বী কল্যাণী মাতা প্রমুখ। বৈঠক শেষে পশ্চিমবঙ্গের সাধুসন্তগণ আন্তর্জাতিক সম্পাদক মিলিন্দজী, সংগঠন সম্পাদক বিনায়করাও এবং সন্ত সম্পর্ক প্রমুখ অশোক তেওয়ারীজীর সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন। আগামী ১৯ আগস্ট দক্ষিণবঙ্গ, ২০ আগস্ট মধ্যবঙ্গ এবং ২২ আগস্ট উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্মেলনের দিন ধার্য হয়। তাতে কেন্দ্রীয় স্তরের অশোক তিওয়ারীজী উপস্থিত থাকবেন।

মেদিনীপুর শহরে 'ন্যায় ব্রতী'র উদ্যোগে রক্তদান শিবির

গত ২১ জুন মেদিনীপুর শহরের সামাজিক সংস্থা 'ন্যায় ব্রতী'র উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের অয়োজন করা হয়। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও ৩২ জন রক্ত দান করেন।

শিবিরে উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর জেলা সঙ্ঘচালক আশিস পান, বিভাগ প্রচারক রজত রায়, মেদিনীপুর বিধানসভার বিধায়ক ডঃ শঙ্কর গুছাইত এবং সমাজসেবী পঙ্কজ পাত্র।

নিবেদিতা সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান

নিবেদিতা সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে গত ১৪ জুন মেদিনীপুর শহরের বিদ্যালয় সমূহের সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতী ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের মা-বাবাদের এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শহরের স্কুলগুলির সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে মানপত্র, আনন্দমঠ পুস্তক এবং রাজ্যের দশের মধ্যে এবং সর্বভারতীয় স্থানাধিকারীদের ডাঃ মনোরঞ্জন দত্ত স্মৃতি নামাঙ্কিত রুপোর পদক তুলে দেওয়া হয়।

উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের অধ্যক্ষ স্বামী প্রার্থনানন্দ মহারাজ, খড়্গপুর আইআইটি-র অধ্যাপক ডিন ডঃ সোমেশ কুমার, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বাণীরঞ্জন দে এবং মেদিনীপুরের বিধায়ক শঙ্কর গুছাইত। সকলেই ছাত্র-ছাত্রীদের আরও উজ্জ্বল সাফল্যের জন্য অনুপ্রাণিত করেন।

সোনারপুরে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গের বিচার বর্গ

গত ৬ ও ৭ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের একল ভবনে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের প্রান্ত বিচার বর্গ অনুষ্ঠিত হলো। বর্গে দক্ষিণবঙ্গের ৭টি জেলা থেকে ১১০ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী সত্রে বক্তব্য রাখেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সহ-সংযোজক ধনপতরাম আগরওয়াল। এরপর স্বদেশী স্বাবলম্বী ভারত অভিযান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ অন্নদাশঙ্কর পাণিগ্রাহী। স্বদেশী ধারণা সম্পর্কে বলেন পূর্বক্ষেত্রের সহ-সংযোজক অম্লান কুসুম ঘোষ। দ্বিতীয় সত্রে স্বদেশী বিকাশ যাত্রা ও স্বদেশী মেলা বিষয়ে বলেন অখিল ভারতীয় সহ-পরিবেশ প্রমুখ বন্দেশঙ্কর সিংহ। তৃতীয় সত্রে দক্ষিণবঙ্গের পরিবেশ এবং তার বিকাশ সম্পর্কে বলেন অসীম মণ্ডল। স্বদেশী থেকে স্বাবলম্বী বিষয়ে বলেন সুব্রত মণ্ডল। চতুর্থ সত্রে স্বদেশী বিকাশে যুবশক্তির ভূমিকা বিষয়ে বলেন অধিবক্তা শ্রীমতী সুমন শ্রীবাস্তব। স্বদেশী বিকাশে মহিলাদের ভূমিকা নিয়ে বলেন পূর্বক্ষেত্রের মহিলা প্রমুখ শ্রীমতী বাণী সরকার। পঞ্চম সত্রে গ্রুপ অনুসারে আলোচনা হয়। ষষ্ঠ সত্রে মিলিতভাবে সাংগঠনিক আলোচনা হয়। পরদিন সকালে সপ্তম সত্রে বক্তা প্রশিক্ষণ হয়। অষ্টম সত্রে স্বদেশী গবেষণা বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পূর্বক্ষেত্র সংযোজক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তারপরে স্বদেশী বিস্তারে বিচার বর্গের ভূমিকা নিয়ে বলেন পূর্বক্ষেত্রের বিচার প্রমুখ ডাঃ দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষাব্যবস্থায় স্বদেশীর ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন নন্দদুলাল চক্রবর্তী। নবম সত্রে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের আগামী কার্যক্রম এবং স্বাবলম্বী ভারত অভিযান নিয়ে নির্দেশনা দেন পূর্বক্ষেত্র সংযোজক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। একটু বিরতির পর সমাপ্তি বক্তব্যও রাখেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত প্রতিনিধিদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো ছিল।

গঙ্গাজলঘাঁটি কৌশিক স্মৃতি সরস্বতী শিশু মন্দিরে বিধায়কদের সংবর্ধনা

বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাঁটি কৌশিক স্মৃতি সরস্বতী শিশু মন্দিরের উদ্যোগে গত ১৪ জুন এক ভাবগম্ভীর গৌরবময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গঙ্গাজলঘাঁটি উন্নয়ন খণ্ডের অন্তর্গত ছাতনা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শালতোড়া বিধানসভা কেন্দ্রের শ্রীমতী চন্দনা বাউড়ী এবং বড়জোড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিল্লেশ্বর সিংহকে সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শিশু মন্দিরের সহ-সম্পাদক কাঞ্চন সেন মোদক এবং কোষাধ্যক্ষ সৌমিত্র দাস-সহ বহু বিশিষ্ট জন।

অনুষ্ঠানের প্রথমে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে অতিথিদের করকমলে মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন, বিদ্যাদেবী সরস্বতী ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন এবং মাতৃবন্দনা হয়। বিদ্যালয়ের আচার্যা শ্রীমতী চিন্ময়ী নাগ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী পাঠ করেন। আচার্য প্রদীপ মুর্মু সংস্কৃত সুভাষিতম্ পাঠ করে তার ব্যাখ্যা করেন।

এরপরে অতিথি পরিচয় ও বরণ হয়। শিশু মন্দির কর্তৃপক্ষ অতিথিদের হাতে উত্তরীয়, জাতীয় পুষ্প ও স্মারক তুলে দেন। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশনের পর বিদ্যালয়ের সম্পাদক নির্মল কুমার সিংহ স্বাগত ভাষণ রাখেন। বিদ্যাভারতীর জেলা প্রমুখ কাজলবরণ সিংহ জনপ্রতিনিধি হিসেবে বিধায়কদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেন। এর পরে তিন বিধায়ক পৃথক পৃথক ভাষণে জনকল্যাণ, শিক্ষার প্রসার, যুবসমাজের উন্নয়ন এবং নিজ নিজ এলাকার সার্বিক বিকাশের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সুপ্রভা গোরক্ষী গীতার শ্লোক আবৃত্তি করেন। আর এক প্রাক্তনী রিকিতা নায়ক নৃত্য পরিবেশনার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পর্বকে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্যায়ে বিদ্যালয়ের সহসভাপতি বাদল চন্দ্র মাজী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমবেতকণ্ঠে বন্দে মাতরম্ গীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র, উত্তরবঙ্গের উদ্যোগে শিলিগুড়িতে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদ্‌যাপন

উত্তরবঙ্গ বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং সংস্কার ভারতীর সহযোগিতায় গত ২০ জুন শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে সাড়ম্বরে পালিত হয় পশ্চিমবঙ্গ দিবস। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তথা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রদেশ সভাপতি ডঃ বিশ্বজিৎ রায় এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিলিগুড়ি মহানগর সঙ্ঘচালক ডাঃ অমিতাভ মিশ্র। প্রবল বৃষ্টিতেও শতাধিক দর্শক প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা পশ্চিমবঙ্গ দিবসের তাৎপর্য এবং হিন্দু হোমল্যান্ড স্থাপনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। শেষে সমবেত কণ্ঠে বন্দে মাতরম গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

পানিহাটিতে 'ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মেধা সম্মান, ২০২৬' প্রদান

গত ১২ জুন পানিহাটি লোকসংস্কৃতি ভবনে ভারতীয় জনতা পার্টি উত্তর কলকাতা শহরতলী জেলা শিক্ষক সেলের উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় (২০২৬) কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান উপলক্ষ্যে 'ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মেধা সম্মান, ২০২৬'-শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের পর সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্'-এর মধ্যে দিয়ে এদিন অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ণমন্ত্রী অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পানিহাটির বিধায়িকা শ্রীমতী রত্না দেবনাথ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি উত্তর কলকাতা শহরতলী জেলা সভাপতি চণ্ডীচরণ রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্য গুড গভর্ন্যান্স সেলের আহ্বায়ক দীপল বিশ্বাস, বিশিষ্ট শিক্ষক প্রীতীশ রঞ্জন কুয়ার, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রসেনজিৎ দত্ত, জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্টজন। এই অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নির্বাহ করেন জেলা শিক্ষক সেলের সদস্য দেবজিৎ বসু, অশোক শূর, অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, রাখালচন্দ্র পাল ও সুব্রত দাস। উত্তর কলকাতার শহরতলী জেলা- স্থিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বিশিষ্ট অতিথিরা সম্মাননা তুলে দেন।

যে স্কুলগুলি হতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের 'ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মেধা সম্মান, ২০২৬'-এ ভূষিত করা হয়, সেই স্কুলগুলি হলো— জিডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুল, বরানগর বিদ্যামন্দির, বিরাটি হাই স্কুল, বিরাটি মহাজাতি বালিকা বিদ্যামন্দির, উদয়পুর হরদয়াল নাগ আদর্শ বিদ্যালয়, বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হাই স্কুল, সারদা বিদ্যাপীঠ, নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দির, দমদম আনন্দ আশ্রম সারদা বিদ্যাপীঠ,সোদপুর চন্দ্রচূড় বিদ্যাপীঠ (ফর বয়েজ), সুখচর শতদল বালিকা বিদ্যায়তন, উযুমপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় (ফর গার্লস্), সোদপুর চন্দ্রচূড় বিদ্যাপীঠ (ফর গার্লস্), রহড়া ভবনাথ ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস্, উযুমপুর আদর্শ বিদ্যালয়, আড়িয়াদহ সর্বমঙ্গলা বালিকা বিদ্যালয়, বাগুইআটি গার্লস্ হাই স্কুল, চারিগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম আদর্শ বিদ্যালয়, প্রমীলা মেমোরিয়াল অ্যাডভান্সড্ স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স ইনস্টিটিউশন (পানিহাটি), বরানগর রাজকুমারী মেমোরিয়াল গার্লস্ হাই স্কুল ও টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল, আড়িয়াদহ। এছাড়াও রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাই স্কুল হতে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ এরাজ্যের পাঁচ জন শীর্ষ স্থানাধিকারীকে 'ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মেধা সম্মান, ২০২৬' দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়।

বিশিষ্ট অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের আগামীদিনে আরও সাফল্য লাভে উৎসাহিত করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উত্তর কলকাতা শহরতলী জেলা শিক্ষক সেলের আহ্বায়ক ড. বরুণ কুমার বিশ্বাস।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

স্বস্তিকা পত্রিকার উদ্যোগে হাওড়া শহরে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

গত ২০ জুন সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার উদ্যোগে হাওড়া শহরের ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের অধিকর্তা ডঃ সরূপ প্রসাদ ঘোষ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা হাওড়া মহানগরের পূর্বতন সঙ্ঘচালক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থানীয় বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ উদয়ন সান্যাল এবং বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক শ্রীমতী সুষমা দে। রেমা চট্টোপাধ্যায় ও ইন্দ্রাণী চক্রবর্তীর কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর ১৯৫৩ সালে স্বস্তিকা পত্রিকায় 'ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতের কল্পনা আদৌ স্বপ্নবিলাস নয়' শিরোনামে প্রকাশিত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কানপুরে সর্বভারতীয় অধিবেশনের প্রথম দিনের ঐতিহাসিক ভাষণের নির্বাচিত কিছু অংশ পাঠ করে শোনান অনুষ্ঠানের সঞ্চালক তথা স্বস্তিকা পত্রিকার প্রতিনিধি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।

বিশিষ্ট সমাজসেবী শঙ্কর মণ্ডল তাঁর ভাষণে বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির জন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। একক গীত পরিবেশন করেন সৌনক চক্রবর্তী। 'খড়কুটো' পুস্তকের লেখক সুষমা দে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান বক্তার ভাষণে ডঃ স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির নেপথ্যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্দোলনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সভার সঞ্চালক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শুভাশিস চক্রবর্তী। জনগণমন জাতীয় সঙ্গীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামাজিক সমরসতা বিভাগের সেবাকাজ

গত ২৮ জুন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামাজিক সমরসতা বিভাগের উদ্যোগে বহরমপুর শহরের খাগড়াঘাট ডোম বস্তিতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে খাতা ও কলম দেওয়া হয়। বছরে দু'বার এই সেবাকাজের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় উৎসাহ প্রদান করা হয়। এবার অতিরিক্ত ১২ মহিলাকে শাড়ি এবং বালক-বালিকাদের জামাকাপড় দেওয়া হয়। এই কাজে সহযোগিতা করেন নগর প্রখণ্ড সভাপতি দেবাশিস দত্ত, মানস সিনহা, বিশ্বজিৎ দাস, বিবেক মণ্ডল, গৌতম সরকার, রাজীব হালদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সভাপতি রামকৃষ্ণ ডোম, জেলা কার্যালয় প্রমুখ জয়ন্ত দাস বক্তব্য রাখেন।

প্রধান বক্তা ক্ষেত্র সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকার তাঁর ভাষণে সামাজিক সমরসতা কী এবং কীভাবে ভেদাভেদ দূর করে হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে ভারতকে বিশ্বগুরু বানানোর কাজ করতে হবে তার

বর্ণনা করে বলেন সেবা তার একটি মাধ্যম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা সামাজিক সমরসতা প্রমুখ সন্তোষ রজক।

ফঃ ৪

কলেজ স্কোয়ারে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উদ্‌যাপন

গত ২০ জুন মধ্য কলকাতা-স্থিত কলেজ স্কোয়ারে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উদ্‌যাপন করল বঙ্গীয় গ্রন্থশিল্প পরিষদ। বঙ্গীয় গ্রন্থশিল্প পরিষদের সঙ্গে যৌথভাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে রাষ্ট্রীয় লেখক সঙ্ঘ ও সংগচ্ছধ্বং ইকোনমি অ্যান্ড কালচারাল ফাউন্ডেশন।

সমবেত কণ্ঠে বেদমন্ত্র— 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্'-এর মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এদিনের 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্বতন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী পূজনীয় স্বামী দিব্যজ্ঞানানন্দজী মহারাজ, কাঞ্চী মঠের সন্ন্যাসী পূজনীয় বিশাখানন্দ তীর্থজী মহারাজ, 'এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা'র ভারত সরকার মনোনীত প্রতিনিধি, বিশিষ্ট গবেষক ও অধ্যাপক ড. বিমলশঙ্কর নন্দ এবং সুলেখিকা ও ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী ড. দেবদত্তা চক্রবর্তী। এছাড়াও অনুষ্ঠানমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উত্তরসূরী প্রসাদরঞ্জন দাশ ও বিশিষ্ট সমাজসেবী তনুজা চক্রবর্তী। বিশিষ্ট বক্তারা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতাগত আত্মপরিচয়ের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং 'পশ্চিমবঙ্গ' সৃষ্টির গৌরবময় উত্তরাধিকারকে স্মরণ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানমঞ্চ হতে 'বঙ্গীয় শিল্পকলা পরিষদ' নামক একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বঙ্গীয় গ্রন্থশিল্প পরিষদের সম্পাদক দেবজ্যোতি চক্রবর্তী। ভরত কুণ্ডুর কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্'-এর মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পাণ্ডুয়ায় স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের মধ্যবঙ্গ প্রান্তের বিচার বর্গ

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের মধ্যবঙ্গ প্রান্তের বিচার বর্গ সম্পন্ন হয় গত ১৩-১৪ জুন হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার বাবা ধাম মতুয়া আশ্রমে। ১০৯ জন পুরুষ এবং ১১ জন মহিলা-সহ মোট ১২০ জন প্রতিনিধি এই বর্গে অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী সত্রে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সহ-সংযোজক ধনপতরাম আগরওয়াল বক্তব্য রাখেন। পরের সত্রে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন পূর্বক্ষেত্র সহ-সংযোজক অম্লান কুসুম ঘোষ। এই সত্রেই পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ে বলেন মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় সত্রে স্বদেশী অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য স্বদেশী ভাবনার বিষয়ে বলেন পূর্বক্ষেত্র বিচার বিভাগ সহ-প্রমুখ ডাঃ দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় সত্রে স্বদেশী অর্থনীতি গড়তে মহিলাদের ভূমিকা বিষয়ে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন পূর্বক্ষেত্র মহিলা প্রমুখ শ্রীমতী বাণী সরকার। এই সত্রেই স্বদেশী অর্থনীতির নির্মাণকল্পে যুব সমাজের ভূমিকা বিষয়ে বলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত পূর্ণকালিক কার্যকর্তা সমরেশ নস্কর। তারপরে স্বদেশী এবং স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ে বলেন মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সংঘর্ষ বাহিনী প্রমুখ গোবিন্দ গোপাল

বিশ্বাস। চতুর্থ সত্রে গট অনুসারে আলোচনা হয়। অংশগ্রহণ করেন বিধানচন্দ্র আখুলী, সমরেশ নস্কর, অরুণাভ নন্দী ও গোবিন্দলাল বিশ্বাস। পঞ্চম সত্রে জৈব কৃষির উপরে স্বদেশী আদর্শের বিষয়ে বলেন বিধান আখুলী। স্বদেশী মেলা বিষয়ে বলেন অরুণাভ নন্দী। স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ে বলেন গোবিন্দ গোপাল বিশ্বাস। পরদিন সকালে বক্তা প্রশিক্ষণ হয়। ষষ্ঠ সত্রে স্বদেশী ও স্বাবলম্বন বিষয়ে বলেন অম্লান কুসুম ঘোষ। সমাপ্তি সত্রেও বক্তব্য রাখেন অম্লান কুসুম ঘোষ।

বিবেকানন্দ সভাগৃহে ‘সুভাষচন্দ্র থেকে শ্যামাপ্রসাদ’-শীর্ষক আলোচনাসভা

গত ২১ জুন রাষ্ট্রবাদী লেখক ও সংগঠকদের উদ্যোগে এবং জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী ট্রাস্টের সহযোগিতায় উত্তর কলকাতা-স্থিত ‘রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র’-এর বিবেকানন্দ সভাগৃহে ‘সুভাষচন্দ্র থেকে শ্যামাপ্রসাদ : এক অজ্ঞাত জীবনের কাহিনি’-শীর্ষক একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সমবেত কণ্ঠে ‘বন্দে মাতরম্’-এর মধ্যে দিয়ে এদিনের সভার শুভ সূচনা হয়। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিরা ভারতমাতা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এদিনের আলোচনাসভায় বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিঙ্কর সামানন্দজী মহারাজ, জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক স্বস্তিকা-র সহ-সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল, বিশিষ্ট শল্যচিকিৎসক ও নেতাজী-গবেষক ডাঃ মধুসূদন পাল ও বিচারক শ্রীমতী দুর্গা খৈতান। ‘ভারত আত্মা থেকে ভারতমাতার রূপ কল্পনা’র বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কিঙ্কর সামানন্দজী মহারাজ। ‘পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট’ -এর বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন সুকেশচন্দ্র মণ্ডল। বাঙ্গালি হিন্দুর ত্রাতা ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হতে না দিয়ে কীভাবে তাঁকে বাঙ্গালির মানসপট থেকে মুছে দেওয়ার সচতুর প্রয়াস চালানো হয়েছে, বামপন্থীরা কীভাবে ইতিহাস-বিকৃতির মাধ্যমে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চরিত্র হননের চেষ্টা করেছে— সেই বিষয়টি তিনি উপস্থাপন করেন। ডাঃ মধুসূদন পালের বক্তব্যে উঠে আসে--- ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’-এর ইতিহাস, সুভাষচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদের অজ্ঞাত জীবন কাহিনি এবং তাঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শের সাদৃশ্য। জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক শ্রী বিজয় ওঝাকে এদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজকদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিধায়ক উদ্যোক্তা ও এদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এদিনের সভায় দু’টি বই প্রকাশিত হয়। লেখক অমিত দাশ রচিত, দে বুক স্টোর প্রকাশিত ‘শ্যামাপ্রসাদ--- বিরোধী আলোচনার স্বরূপ’ এবং পঙ্কজ সমদ্দার রচিত, ছান্দসী প্রকাশন প্রকাশিত ‘সিংহপুরুষ শ্যামাপ্রসাদ’— এদিনের সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিরা এই বই দু’টির আবরণ উন্মোচন করেন। সংগঠকদের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতাজী অনুগামী ও জাতীয়তাবাদীদের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইন্দ্রাশিস ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রবীর ভট্টাচার্য। জাতীয় সঙ্গীত ‘জনগণমন অধিনায়ক’-এর মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ঐকতান সভাগৃহে সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের যোজনা বৈঠক

গত ২৮ জুন কলকাতা বিধাননগরের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের ঐকতান সভাগৃহে সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের যোজনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সক্ষমের অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক শ্রীচন্দ্রশেখরজী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত। সাংগঠনিক পরিকল্পনা এবং আগামীদিনের কাজের রূপরেখা নির্ধারণ করা ছিল এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য। উদ্বোধনী ভাষণ দেন অদ্বৈতচরণ দত্ত এবং সাংগঠনিক ও দেশব্যাপী সংগঠনের বর্তমান স্থিতি বিষয়ে আলোকপাত করেন শ্রীচন্দ্রশেখরজী। বৈঠকে বিভিন্ন জেলা থেকে দিব্যাঙ্গজন কার্যকর্তা-সহ ৯০ জন অংশগ্রহণ করেন।

বৈঠকে দিব্যাঙ্গদের জন্য আবাসিক কেন্দ্র দিশাগ্রামের একটি তথ্যচিত্র এবং সক্ষম দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের কার্যাবলী বিষয়ক তথ্যচিত্র দেখানো হয়। শেষে সহসভাপতি ডাঃ তরুণ কুমার সরকার ও অরিন্দম উপাধ্যায়ের সহযোগে প্রান্ত সভাপতি ডাঃ অরবিন্দ ব্রহ্ম নবগঠিত প্রান্ত ও জেলা সমিতির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন।

লোকপ্রজ্ঞার আঁটপুর চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে আলোচনা সভা

অখিল ভারতীয় প্রবুদ্ধ মঞ্চ প্রজ্ঞাপ্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা লোকপ্রজ্ঞার আঁটপুর চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২৯ জুন হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া ডি এন হাই স্কুলে 'বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর এবং ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাঙ্গিপাড়া সার্কেলের বিদ্যালয় পরিদর্শক (এসআই) অভিজিৎ জানা, লোকপ্রজ্ঞা মধ্যবঙ্গ প্রান্তের সহ-সংযোজক মিলন কুমার দে এবং জাঙ্গিপাড়া ডিএন হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অঞ্জন পাল। আলোচনা সভায় বিদ্যালয়ের ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং ১৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন, ভাবনা এবং বন্দে মাতরম্-এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা হয়।

'শ্রদ্ধা'র ১৮১তম শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

গত ২৮ জুন সিউড়ীর শুড়িপুকুর পাড়ার ৮৮ বছর বয়স্ক অকৃতদার বিশিষ্ট সমাজসেবী নির্মল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সিউড়ীর বিশিষ্ট সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধা এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের ১৮১ তম শ্রদ্ধা নিবেদন করে স্থানীয় অনিকেত সুনীতি চট্টরাজ ভবনে। তিনবার ওঙ্কারধ্বনি উচ্চারণ করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন সংস্থার সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দাস। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সিউড়ী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। পূজন করার পর অনুভব ব্যক্ত করেন ভবনের আবাসিক উৎপল সাহা। মাল্যভূষিত করেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। মানপত্র পাঠ করেন সহসভাপতি আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়।

শ্রদ্ধা সংস্থার বিষয়ে আলোকপাত করেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। আরতি করেন সুজাতা বিষ্ণু। অর্ঘ্য হিসেবে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে উত্তরীয়, বস্ত্র, গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন নিবেদন করেন বন্দনা দাস, শুভ্রা ব্যানার্জি, রাখী স্বর্ণকার, জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন টিনা দাস ও আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অসীমা মুখোপাধ্যায়। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন মিলন চট্টোপাধ্যায়।

শেষে শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। অতিথি আপ্যায়ন ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ভবনের ম্যানেজার জয় ব্যানার্জি এবং তত্ত্বাবধায়ক ঝরনা ধীবর, মরনা ধীবর ও মনোজ দাস। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন শিক্ষক সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য।

মহাপ্রভু জগন্নাথের মহাপ্রসাদ

উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল

শ্রীভগবান পুরীধামে জগন্নাথরূপে নিত্য বিরাজিত। সনাতন হিন্দুধর্মে চারটি ধাম— অগ্রগণ্য বদ্রীনাথধাম, দ্বারকাধাম, শ্রীক্ষেত্র অর্থাৎ পুরীধাম ও রামেশ্বর ধাম। এর মধ্যে শ্রীভগবান বদ্রীনাথ ধামে স্নান করেন, দ্বারকায় পোশাক পরেন, পুরীতে অন্নগ্রহণ করেন আর রামেশ্বরমে বিশ্রাম নেন। চারটি ধামের মধ্যে ভোজনের জন্য পুরীধামের প্রসিদ্ধি।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেব সাক্ষ্য প্রসাদ গ্রহণ করেন। জগন্নাথের উদ্দেশে প্রদত্ত সমস্ত বস্তুই 'কৃষ্ণ অধরামৃত'।

স্বয়ং মা লক্ষ্মী বৈষ্ণব-অগ্নিতে জগন্নাথের জন্য রন্ধন করেন। অতঃপর স্বর্ণপাত্রে তা প্রভুর সমীপে উপনীত হয়, নৃসিংহ মন্ত্রে প্রোক্ষণের পর গোপাল মন্ত্রে হয় নিবেদন।

'লক্ষ্মীর রন্ধন শেষে বহে ভোগ যত দক্ষিণের পথে আসি দেউল পূর্ণিত।।

কিন্তু তাকে 'মহাপ্রসাদ' বলার কারণ কী? এই বিষয়ে একটি কাহিনি আছে। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের আবির্ভাবের আগে খণ্ডিত সতীর দেহের নাভি এই স্থানে পতিত হওয়ার দরুন শ্রীক্ষেত্রে অন্য যে সতীপীঠ; পীঠেশ্বরী দেবী বিমলা, ভৈরব শিব। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের জগন্নাথের প্রতিষ্ঠার সময় বিমলা দেবী বেঁকে বসেন, তিনি জায়গা ছাড়তে নারাজ, জগন্নাথ তখন বিমলাদেবীর দ্বারস্থ হন। অবশেষে, বিমলাদেবীর সঙ্গে জগন্নাথের মধ্যে একটি চুক্তি হয়, জগন্নাথদেবকে ভোগ নিবেদনের পর তা বিমলাদেবীকে নিবেদন করতে হবে; বিমলাকে নিবেদনের পর তা হবে 'মহাপ্রসাদ'। এই শর্তে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের প্রবেশাধিকার ঘটে।

'সেই ভোগ জগন্নাথ হৈলে নিবেদন
সে মহাপ্রসাদ হয় শুন দ্বিজগণ।।

তদন্তরে সেই ভোগ পুনরপি বয়

বিমলার মন্দিরে সকল জয় হয়।
তথা গিয়া মহা মহাপ্রসাদ হয়
সে প্রসাদ বিমলা ত বণ্টন করয়।।'

অন্যত্র প্রসাদ হতে পারে, কিন্তু মহাপ্রসাদ 'শ্রীক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র অসম্ভব। লক্ষ শালগ্রাম শিলার রত্নবেদিতে শ্রীভগবান উপবিষ্ট, যিনি দারুব্রহ্ম নামেও বিশ্বজগতে বিদিত। সেই দারুব্রহ্মের সকাশে প্রথমে নিবেদিত হয় বিভিন্ন ভোগ। অতপর মহাশক্তি স্বরূপিনী বিমলাদেবীর কাছে আনীত হয়। পরমেশ্বরী বিমলাদেবী কর্তৃক তা আস্বাদিত হয়ে মহাশক্তিময় পরম পবিত্র, চিন্ময় ব্রহ্মরূপে ব্যক্ত হয়।

আমরা জগন্নাথক্ষেত্রে ছোটো ছোটো লালচে রঙের পুঁটলি করে মহাপ্রসাদ বিক্রি হতে দেখি। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার পূজা দিলেও এরকম একটি লালচে রঙের পুঁটলির মধ্যে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়, যা জগন্নাথ ভক্ত হিন্দুগণ বাড়িতে রেখে দেয়, বিভিন্ন সময়ে, সংকটে তা গ্রহণ করে। জগন্নাথের উদ্দেশে নিবেদিত অন্ন বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে লালচে রঙের পুঁটুলি করে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। সেই স্তরগুলি সুন্দর পুরাণ অবলম্বনে আলোচনা করা যেতে পারে।

স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ জগন্নাথ ভগবানের ভোগরাগের সামগ্রী বাইরে থেকে আনা হয় না। পুরীর মধ্যে জগন্নাথের নিজস্ব জমি আছে। সেখানে ধান চাষ হয়। ধান ভেঙে যা হয় তাকে আমরা চাল বলি। এই চালকে ওড়িয়া ভাষায় বলে 'অমুনিয়া', অমুনিয়া আসে শ্রীমন্দিরে। বৈষ্ণব-অগ্নি সংস্কার করে ছ'টা ঝিক যুক্ত উনুনে ন'টা মাটির হাঁড়ি পর পর বসানো হয়। চাল পাক হলে তা 'অন্ন', নির্দিষ্ট পাণ্ডা এই অন্ন বহন করে আনেন গর্ভগৃহে। জগন্নাথের সামনে আনা হলে তা হয় 'ছেক', সেই 'ছেক'কে ভৈরবী মন্ত্রে স্থাপন করা হলে তা হয় 'ভোগ'। এই ভোগ ফুল, তুলসীপত্র দ্বারা পূজা হয়, তখন তা হয় নৈবেদ্য— 'পক্ক নৈবেদ্য।' এই নৈবেদ্য জগন্নাথ গ্রহণ করেন, তখন তা হয় 'প্রসাদ'। এই প্রসাদ বিমলাদেবীর কাছে ভৈরবী কমলাচক্রে পুনরায় স্থাপন করা হয়, যে সুবর্ণ পাত্রের মাধ্যমে বিমলাদেবীকে নিবেদন করা হয়, সেই পাত্রটিকে ত্রিপুরসুন্দরী যন্ত্রম রূপে ধ্যান করা হয়। মা বিমলাকে প্রসাদ নিবেদন করলে, তখন তা হয় 'মহাপ্রসাদ'।

এর পর মহাপ্রসাদ চলে আসে আনন্দবাজারে। মহাপ্রসাদ আনন্দবাজারে এসে হয় 'কৈবল্য'। এই কৈবল্য কোনোভাবেই উচ্ছিষ্ট হয় না; তাতে স্পর্শাদি কোনো দোষ বর্তায় না। জাতপাত নির্বিশেষে ভক্তগণ যখন তা গ্রহণ করে তখন তা হয় 'অভরা'। এই 'অভরা'র অবশিষ্টাংশ টিনের চালা দেওয়া বিশাল চত্বরে শুকানো হয়, এই শুকনো প্রসাদ হয় 'নির্মাল্য'। এই 'নির্মাল্য'-ই লালচে, সেলাই করা পুঁটলির মাধ্যমে বিক্রি হয়। এই নির্মাল্যের একটি দানা যখন ভক্তরা মুখে নেয়, তখন তাকে বলে 'পরম ব্রহ্ম প্রাপ্তি'।

' অসীম মহিমা প্রভু পূর্ণব্রহ্ম হরি।
নীলাচলে অবতার দারুরূপ ধরি।।
কলি ভব নিস্তারিতে দারু ভগবান।
যাহার মহিমা হয় বেছে অসন্ধান।।'

তিনি মানুষের মতো শয্যা গ্রহণ করেন, ঘুম থেকে জাগেন, দাঁত মাজেন; বিভিন্ন বেশভূষা, প্রসাধনীতে সজ্জিত হন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আহার্য গ্রহণ করেন। আর আমাদের মতো মন্দভাগ্য, কলিহত জীবের জন্য মহাপ্রসাদ দান করেন।

'অন্নের মহিমা আর কহিতে না পারি
সেই অন্নসকলঅরিষ্ট নাশকারী।।
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে প্রসাদ যে করে ভক্ষণ
পঞ্চম পাপের পাপী মুক্ত ততক্ষণ।।
অশেষ বিপদ খণ্ডে কি কহিব আর
পূর্ব জন্মে মহাপাপে হয়ত নিস্তার।"

ভক্ত বৎসল শ্রীভগবানের মহাকৃপার নির্দশন এই মহাপ্রসাদ।

মহাপ্রসাদের সঙ্গে অন্য কোনো খাবার গ্রহণ না করাই শ্রেয়। প্রসাদ গ্রহণের সময় 'বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমঃ' বলে গ্রহণ করা অধিক পুণ্যজনক এবং জগন্নাথের প্রতি ভক্তিবর্ধক।

জগন্নাথের সঙ্গে মা বিমলা তথা দুর্গা মহাদেবীর কৃপাশক্তি মহাপ্রসাদে বর্তমান। প্রসাদ গ্রহণের সময় অবশ্যই শ্রদ্ধা-ভক্তিযুক্ত চিত্তে গ্রহণ করা কর্তব্য। কারণ, এই চিন্ময়বস্তু হেলাফেলার সামগ্রী নয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে জগন্নাথের প্রতি ভক্তিতে নয়, ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মহাপ্রসাদকে মহা প্রহসনে পরিণত করেছিলেন। জেলায় জেলায় রান্না হয়ে রেশন দোকানের মাধ্যমে ঘরে ঘরে তথাকথিত 'মহাপ্রসাদ' পৌঁছে দিয়ে রাজনীতি জগতে ক্ষমতা ধরে রাখার দৌড়ে এক কদম এগিয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই কাজ অশাস্ত্রীয়। জগন্নাথ যেমন ভক্তবৎসল, পতিতপাবন, তেমনি তিনি দর্পহারীও। সেটা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উপলব্ধি করলে তার এবং তার সমর্থকদের মঙ্গল। মহাপ্রসাদ গ্রহণে যেমন জাতপাতের বিচার নেই, তেমনি তা লাভে সর্বতীর্থ ভ্রমণের পুণ্য অর্জন হয়।

সাধু-সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ব্রতী যে কোনো বার, তিথিতে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলে ব্রতের আশু ফল লাভ করে। মহাপ্রসাদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে একাদশী তিথি পালনের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। শুধু নিজে গ্রহণ নয়, দীন-দুঃখী ভক্তকে মহাপ্রসাদ দান করলে জগন্নাথ তার প্রতি প্রসন্ন হন। নিত্য কণিকামাত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলে দেহ-মনের জড়ত্ব দূর, শরীর সুস্থ হয়, মনে সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হয়। মহাপ্রসাদ গ্রহণে যেমন জাতপাতের বিচার নেই, তেমনি স্থান-অস্থানের কোনো নিয়ম নেই। কারণ মহাপ্রসাদ সদা সর্বদোষমুক্ত।

মহাপ্রসাদের সঙ্গে কার তুলনা চলে? এ যে স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গজ্যোতি, এঁর তুলনা যদি হয় তা হলে অব্যয় অক্ষয় নিত্য, সনাতন শ্রীনারায়ণের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে।

পরমহংস যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ এই জগতে তিনটি বস্তুকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম রূপে শ্রদ্ধা করতেন। প্রথম বস্তু গঙ্গাজল, ঠাকুরের কাছে তা জলব্রহ্ম। দ্বিতীয় বস্তু বৃন্দাবনের ধূলি আর তৃতীয় বস্তু এই মহাপ্রসাদ। শ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল মহারাজের একবার অসুখ করেছে। তাই নিয়ে ঠাকুরের চিন্তার শেষ নেই। তিনি বলছেন, এই দেখ, রাখালের অসুখ। সোডা খেলে কি ভালো হয় না? কী হবে বাপু! রাখাল তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা। ঠাকুরের অপর শিষ্য শরৎ মহারাজ, স্বামী সারদানন্দও মহাপ্রসাদকে খুব মান্য করতেন। একবার অসুস্থ হয়ে তিনি নিয়মিত কয়েকদিন ধরে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন এবং আরোগ্য লাভ করেন। এই অশেষ মাহাত্ম্যযুক্ত মহাপ্রসাদের জয় হোক। □

রথযাত্রা হলো জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন

প্রদীপ মারিক

রথযাত্রা হলো রাধা-কৃষ্ণ, ভক্ত-ভগবানের, জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন। রথযাত্রা ভারতের একটি অন্যতম উৎসব। প্রতিবছর আষাঢ় মাসের শুক্লাপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব সাড়ম্বরে পালন করা হয়। জগন্নাথের বর্ণ কৃষ্ণ, কারণ তিনি সর্বাকর্ষক। সকলকে আকর্ষণ করতে পারেন। তাঁর দুটি নয়ন স্থির প্রশান্ত ও আনন্দময়। শ্রীজগন্নাথের অধরপ্রান্তে ফুটে উঠেছে মধুর হাসি, যে হাসিতে ঝরে পড়ছে পরমানন্দ। এক কথায় তিনি হলেন আনন্দের জমাট বিগ্রহ। রথযাত্রার দিন পুরীর জগন্নাথ মন্দির-সহ দেশের সকল জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্র বিগ্রহ মন্দিরের বাইরে সর্বসমক্ষে আনা হয়। তারপর তিন জনকে আলাদা তিনটি সুসজ্জিত রথে স্থাপন করে পূজা সম্পন্ন করার পর রথ টানা হয়। পুরীর রথযাত্রা উৎসবে মূল দর্শনীয় এই সুসজ্জিত তিনটি রথ। রথ তিনটির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

যাত্রার প্রথমে থাকে অগ্রজ বলরামের রথ। এই রথের নাম তালধ্বজ। এতে মোট চোদ্দোটি চাকা আছে। এর উচ্চতা চুয়াল্লিশ ফুট। রথটি নীল রং দ্বারা আবৃত। বলরামের পিছনে থাকে ভগ্নী সুভদ্রার রথ। এই রথের নাম দর্পদলন। এতে মোট বারোটি চাকা আছে। এর উচ্চতা তেতাল্লিশ ফুট। সুভদ্রার রথটি ধ্বজা বা পতাকায় পদ্মচিহ্ন আঁকা আছে, তাই এই রথটির আরেক নাম পদ্মধ্বজ। রথটি লাল রং দ্বারা রঞ্জিত। সবার পিছনে থাকে শ্রীজগন্নাথদেবের রথ। এই রথের নাম নন্দীঘোষ। পতাকায় কপিরাজ হনুমানের মূর্তি আঁকা আছে, সেজন্য এই রথের আরেক নাম কপিধ্বজ। এই রথে মোট ষোলোটি চাকা আছে। প্রতিটি চাকার ব্যাস সাত ফুটের, উচ্চতা পঁয়তাল্লিশ ফুট। রথটি হলুদ রং দ্বারা রঞ্জিত।

রথযাত্রার মাহাত্ম্য সম্পর্কে কঠোপনিষদে বিশদভাবে বর্ণনা রয়েছে। তাতে উল্লেখ আছে মানুষের দেহ হচ্ছে একটি রথ এবং ঈশ্বর হচ্ছেন তার সারথী, যিনি এই ভবসাগর পরিভ্রমণ পরিচালনা করেন। আত্মা হচ্ছে পরিভ্রমণকারী এবং দেহ তা ধারণ করে জন্ম থেকে জন্মান্তরে বিচরণ করে। প্রাণশক্তি, সহিষ্ণুতা, আত্মসংযম, দয়া, দাক্ষিণ্য, সমতা,

প্রশান্তিকে ধারণ করে যে দেহধারী সঠিক পথ ধরে পরিক্রমা করতে পারে সেই রথ ঈশ্বরের নির্ধারিত আবাসস্থলে পৌঁছতে পারে এবং তার আর পুনর্জন্ম হয় না, বিষ্ণুলোকে বা নিত্যধামে গমন করে মহামিলনের মাধুরী আস্বাদন করতে পারে, জীবন হয় ধন্য। এমন একটি আধ্যাত্মিক ভাবনা লালন করে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রভু জগন্নাথকে রথাসীন অবস্থায় দর্শন করতে বা রথের রশি ধরতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জনও দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তাদের বিশ্বাস, রথাসীন জগন্নাথ প্রভুকে দর্শন করে পরম পুণ্য প্রাপ্তি হয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, রথারূঢ় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করলে এই জড়জগতের জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। সংস্কৃত ভাষায় রথের অর্থযান এবং যাত্রা মানে শোভাযাত্রা। ক্ষণিকের জন্য জগন্নাথদেবকে রথের উপর দর্শন করাকে বহু পুণ্য কর্মের ফল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি এতই পবিত্র যে, কেউ যদি এই দিনে রথ স্পর্শ করেন অথবা এমনকী রথের দড়ি স্পর্শ করেন, তাহলে বহু পুণ্য কর্মের ফল লাভ করতে পারেন। কথিত, রথযাত্রার দিন যদি রথের রশি ছোঁয়া যায়, তাহলে তাতে ১০০ যজ্ঞের সমান পুণ্য লাভ হয়। রথযাত্রায় যাঁরা অংশ নেন তাঁদের মোক্ষ লাভ হয় বলেও বর্ণিত রয়েছে। প্রতিবছর জগন্নাথদেবের রথাযাত্রার উদ্বোধন করেন সেখানকার রাজা। রাজত্ব না থাকলেও বংশপরম্পরায় পুরীর রাজপরিবারের নিয়মানুযায়ী, যিনি রাজা উপাধিপ্রাপ্ত হন, তিনি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর রথের সামনে এসে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও সোনার ঝাড়ু দিয়ে রথের সম্মুখভাগে রাস্তা ঝাঁট দেওয়ার পরই রথের রশিতে টান পড়ে। শুরু হয় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা।

জগন্নাথদেবের রথের প্রতিটি অংশই অতি পবিত্র। কারণ তিনটি রথেই বিরাজ করেন সমস্ত দেবতা। তাই এই রথের রশি একটু স্পর্শ করা বা টানা মানে, অশেষ পুণ্যলাভ করা। এই রথের রশি একটু স্পর্শ করা বা টানা মানে, সমস্ত দেবদেবীর চরণ স্পর্শ করা। ওড়িশার প্রাচীন পুঁথি 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ'-এ জগন্নাথদেবের রথযাত্রার ইতিহাস প্রসঙ্গে রয়েছে যে, এই রথযাত্রার প্রচলন হয়েছিল প্রায় সত্যযুগে। সে সময় ওড়িশা মালবদেশ নামে পরিচিত ছিল। সেই মালবদেশের সূর্যবংশীয় পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণুর জগন্নাথরূপী মূর্তি নির্মাণ করেন এবং রথযাত্রারও স্বপ্নাদেশ পান। পরবর্তীতে তাঁর হাত ধরেই পুরীতে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ ও রথযাত্রার প্রচলন শুরু হয়। পুরাবিদদের মতানুযায়ী, পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা থেকে বঙ্গেও রথযাত্রার সূচনা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচল থেকে এই ধারাটি এই বঙ্গে নিয়ে আসেন। চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবরা বঙ্গে পুরীর অনুকরণে রথযাত্রার প্রচলন করেন।

এখন পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গাতেই এই রথযাত্রা অত্যন্ত জনপ্রিয়। রথ এসে পৌঁছায় মন্দিরের সামনের বড়ো রাস্তায়। পুরীর রাজা উত্তর দিকের পথ সোনার ঝাড়ু দিয়ে ঝাঁট দিয়ে দিলে রথ চলা শুরু হয়। প্রথমে রথ যায় গুণ্ডিচা মন্দির, গুণ্ডিচা ছিলেন দারুব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী। সেখান থেকে মাসির বাড়ি। মোট পথ ২ কিলোমিটার। আবার উলটো রথের দিন 'গোটে পাহাণ্ডি' প্রক্রিয়ায় গর্ভগৃহে এসে পৌঁছান শ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম। রথের দিন প্রতিটি রথকে পঞ্চাশ গজ দড়িতে বেঁধে আলাদা আলাদা ভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় গুণ্ডিচাবাড়ি। রথ নির্মাণের জন্য কাঠের সংগ্রহ বসন্ত পঞ্চমীর দিন থেকেই শুরু হয়। রথের নির্মাণ অক্ষয় তৃতীয়া থেকে শুরু হয়। সেই কাঠ সংগ্রহ করা হয় মাঘ মাসের বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে। আর সেই কাঠগুলি নির্দিষ্ট পরিমাণে কাটা শুরু হয় রামনবমী তিথি থেকে। রথগুলিতে অন্য কোনো ধাতু ব্যবহার করা হয় না। রথের পেরেকও তৈরি হয় কাঠ দিয়ে।

ভগবান জগন্নাথ, ভগবান বলভদ্র ও দেবী সুভদ্রা এই তিনটি দেবতাকে উৎসর্গীকৃত তিনটি রথ সম্পূর্ণ করতে প্রায় দুই মাস সময় লাগে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার তৈরি অসমাপ্ত মূর্তিই পরমেশ্বর শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম রথের মেলা বসে মাহেশে। মাহেশের রথযাত্রাকে ঘিরেও রয়েছে অন্যতম কাহিনি। পুরীতে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার দিন মাহেশের মন্দিরের চূড়ায় বসে থাকে নীলকণ্ঠ পাখি। ৫০০ বছর আগে সন্ন্যাসী ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী পুরীতে গিয়েছিলেন জগন্নাথ দেবকে নিজে রেঁধে ভোগ খাওয়াবেন বলে। কিন্তু সেখানকার সেবকরা তাতে রাজি না হওয়ায় তিনি শোকে দুঃখে স্নান-খাওয়া ত্যাগ করেন। তখন একদিন স্বপ্নে তার দেবদর্শন হয়। জগন্নাথদেব তাকে নির্দেশ দেন মাহেশে যেতে। সেখানে গিয়ে এক বৃষ্টি ভেজা রাতে সন্ন্যাসী ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী গঙ্গায় ভাসমান তিনটি নিম কাঠ পান। এই কাঠ দিয়েই তিনি জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার মূর্তি তৈরি করেন। আজও এই মূর্তিগুলি মাহেশে পূজিত হয়। প্রতি ১২ বছর অন্তর বিগ্রহের অঙ্গ মার্জনা করা হয়।

মাহেশে নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয় জগন্নাথের রথ। জমিদার রাজবল্লভ রায় চৌধুরীর সময় থেকেই এই রথযাত্রার সূত্রপাত, যা আজও সাড়ম্বরে পালিত হয়ে আসছে।

বারুইপুর পদ্মপুকুর ইউথ ক্লাব রথযাত্রার আয়োজন করে। এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সাধারণ মানুষদের মধ্যে খুব আনন্দ সঞ্চারিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের পদধূলি ধন্য বারুইপুর মঠ রথযাত্রার আয়োজন করে। এই মঠ থেকে দীক্ষিত মহুয়া উপাধ্যায় পালের কথায়, শ্রীচৈতন্যের ভাবধারায় এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণে মঠের সন্ন্যাসী থেকে সাধারণ মানুষরা খালি পায়ে কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে নাচতে নাচতে বিভোর হয়ে ভট্টাচার্য্য পাড়ায় মাসির বাড়ির উদ্দেশে যায়।

রথযাত্রায় ভক্তের মধ্যেই ভগবান লীন হয়ে থাকেন। কলির মানুষের দুঃখ কলঙ্ক পাপ মোচনকারী পরমেশ্বর শ্রীশ্রীজগন্নাথ সর্ব সাধারণের মাঝে, তাই মানুষের বিশ্বাস রথযাত্রা দর্শন করা এবং ভগবানের নাম করা এবং রথের রশি ধরলে পুণ্যার্জন সম্ভব হয়। □

মার্বেল প্যালেসের ঐতিহ্যমণ্ডিত রথযাত্রা

সপ্তর্ষি ঘোষ

বাঙ্গালির বারো মাসে তেরো পার্বণের একটি অন্যতম প্রধান পার্বণ রথযাত্রা। রথযাত্রা বলতে আমরা সাধারণত আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত জগন্নাথদেবের রথযাত্রাই বুঝি। কুমোরটুলিতে এবং অনেক বনেদি বাড়িতে রথযাত্রার দিন দুর্গা প্রতিমার কাঠামো পূজা হয়। সেই হিসেবে রথযাত্রাকে দুর্গাপূজার সূচনালগ্ন বলে অভিহিত করা হয়। সাবেক কলকাতায়ও রথযাত্রার যথেষ্ট সমারোহ ছিল। সেই সময়ে বাঙ্গালিবাবুরা তো বটেই, সাহেবরাও রথযাত্রা দেখতে রাস্তার দু'ধারে ভিড় করতেন। শোনা যায়, তদানীন্তন সময়ে কলকাতায় রথের শোভাযাত্রা দেখতে এত ভিড় হতো যে, ১৮৩৪ সালে পুলিশ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে বড়ো রাস্তা দিয়ে রথযাত্রা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।

কলকাতায় বেশ কিছু পারিবারিক রথ আছে, যা আজও তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে সগৌরবে বহন করে চলেছে। সময়ের পরিবর্তন এবং বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আগের মতো জাঁকজমক না থাকলেও আজও অনেক বনেদি বাড়িতে রথের দিন জগন্নাথদেবের রথের চাকা সচল হয়ে ওঠে।

উত্তর কলকাতার মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে মার্বেল প্যালেসে রাজেন্দ্র মল্লিক পরিবারের রথযাত্রা কলকাতার একটি অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত উৎসব। এই রথযাত্রার সূচনা করেন পরিবারের কৃতী পুরুষ বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক আনুমানিক ১৮৪০ সালে। রথযাত্রার বর্ণনায় যাবার আগে মল্লিক পরিবার সম্বন্ধে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পরিবারের আদিপুরুষ নীলমণি মল্লিক মাতুলালয় থেকে জগন্নাথদেব জীউয়ের বিগ্রহ পেয়ে চোরবাগানে জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির ও অতিথিশালা নির্মাণ করে দরিদ্র নারায়ণের নিত্যসেবা প্রবর্তন করেন, যা আনুমানিক দুই শত বছর ধরে আজও অব্যাহত। দরিদ্র নারায়ণের নিত্যসেবা না হওয়া পর্যন্ত নীলমণি ও তাঁর পত্নী হীরামণি দাসী জল গ্রহণ করতেন না। কলকাতা থেকে পুরীর পথে মাঝে মাঝে যাত্রীনিবাস নির্মাণ তাঁর কীর্তি। কলকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন নীলমণি মল্লিক। তিনি তদানীন্তন কলকাতার খ্যাতনামা ব্যক্তি বিশ্বম্ভর মল্লিকের কনিষ্ঠ পুত্র

রাজেন্দ্রকে দত্তক নেন। তখন তাঁর বয়স ২ বছর ৬ মাস। এই মহান পুরুষের জন্ম ২৪ জুন ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ শুভ রথযাত্রার পুণ্যতিথিতে। রাজেন্দ্রর কাব্য প্রতিভা সর্বজনবিদিত। তাঁর রচিত ও সুরারোপিত জগন্নাথদেবের স্তুতিবন্দনা নিত্য সন্ধ্যায় আজও সন্ধ্যারতির পর ঠাকুরবাড়িতে কীর্তনিয়াদের মধুর কণ্ঠে মহাপ্রভুর সম্মুখে গীত হয়। মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের আশীর্বাদই ছিল রাজেন্দ্রর জীবনের একমাত্র পাথেয়। এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনাবসান হয় ৬৯ বছর বয়সে ১৮৮৭ সনের ১৪ এপ্রিল। দিনটি ছিল ১ বৈশাখ। বাংলা নববর্ষের দিন বঙ্গমাতা হারালো একজন কীর্তিমান পুরুষকে।

রথযাত্রা মূলত স্নানযাত্রা থেকে শুরু। সেদিন সকালে জগন্নাথদেবকে বিভিন্ন তীর্থের জল দিয়ে স্নান করানোর পর বিশেষ পূজা, আরতি, ভোগরাগ হয়। এরপর পনেরো দিন তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকেন। এই সময়ে বিগ্রহের অঙ্গরাগ হয়। এই পক্ষকালকে বলা হয় 'অনবসর'। রথের একদিন আগে প্রতিপদ তিথিতে জগন্নাথদেব নবকলেবর ধারণ করে পুনরায় মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন।

রথের দিন সকাল থেকেই মার্বেল প্যালেসে উৎসবের পরিবেশ। যেন সারা বছরের সাগ্রহ প্রতীক্ষার অবসান! অতিথি সেবার আয়োজন করা হয়। এই ক'দিন দ্বিপ্রাহরিক কীর্তনের আসর বসে মন্দিরে। নিরামিষ বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও রথের দিন মল্লিক বাড়িতে নয় রকমের খিচুড়ি রান্না হয় এবং রান্না কয়লার আঁচে নয়, কাঠের আগুনে হয়। সোজা রথ থেকে উলটোরথের মধ্যবর্তী সাতদিন জগন্নাথদেবকে সাত রকম বেশে সাজানো হয়। উলটোরথের দিন জগন্নাথদেবকে ছাপান্ন রকম ভোগ নিবেদন করা হয় এবং প্রসাদ হিসেবে অতিথিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। উলটোরথেও সন্ধ্যেবেলায় জগন্নাথদেবকে রথে অধিষ্ঠান করিয়ে রথ টানা হয়। মল্লিকদের রথের যাবতীয় আচার অনুষ্ঠানে পুরীর প্রথা অনুসৃত হয়। মল্লিক পরিবারের বর্তমান বংশধররা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে রথযাত্রা উৎসব পালন করে চলেছেন। □

ফঃ ৫

নৈহাটি কাঁঠালপাড়ার ঐতিহ্যমণ্ডিত রথযাত্রা

বৈশাখী কুণ্ডু

রাধারাণী উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই উপন্যাসের কেন্দ্র শ্রীরামপুরের মাহেশের রথযাত্রা। যা বঙ্গের প্রাচীনতম এবং ভারতের দ্বিতীয় রথযাত্রা। সম্ভবত ১৩৯৬ সালে সূত্রপাত। কাহিনির প্রেক্ষাপট সাহিত্য সম্রাটের নিজ বাসভবনের রথযাত্রার উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা।

নৈহাটি স্টেশনের পূর্বদিকে কাঁঠালপাড়ায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক নিবাস। জানা যায়, তাঁর বড়দাদা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হয় রথযাত্রা। কষ্টি পাথরের কুলদেবতা রাধাবল্লভ রথে বিরাজ করেন। রাজার মতোই আয়োজন করা হতো। রথটি কাষ্ঠ নির্মিত পিতলের পাত দিয়ে মোড়া। বঙ্কিমচন্দ্র তমলুকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন সেখানকার কারিগরদের দিয়ে রথটি তৈরি করিয়ে রূপনারায়ণ ও গঙ্গাপথে নৌকাযোগে নৈহাটির ঘাটে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলেন। রথটি তাঁর মাতা দুর্গাসুন্দরীর নামে উৎসর্গ করেন। তাই তিনি সবার আগে রশিতে টান দিতেন। এই রশিটি এত বড়ো ছিল যে অন্দরমহল থেকে তিনি টান দিতেন।

একটি প্রশ্ন আসে, এই রথে জগন্নাথদেব নেই কেন? পারিবারিক সূত্র থেকে জানা যায়, এক সন্ন্যাসী তাঁর ঝোলার মধ্যে কষ্টিপাথরের রাধাবল্লভের বিগ্রহটিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ক্লান্ত বোধ করায় ঝোলাটিকে মাটিতে নামিয়ে রাখেন। কিন্তু যাওয়ার সময় ঝোলাটি আর তুলতে পারেননি। তাই রঘুদেব ঘোষালের কাছে দেবতার সেবার ভার দিয়ে যান। পরবর্তীকালে এই রাধাবল্লভ হয়ে ওঠেন চট্টোপাধ্যায় পরিবারের কুলদেবতা।

কে এই রঘুদেব ঘোষাল? নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করতে যাওয়ার সময় নৈহাটির অর্জুনা পুকুরের কাছে ছাউনি ফেলেছিল। রঘুদেব ঘোষাল নবাবের সৈন্যের রসদ সংগ্রহ করে দিয়ে নবাবের আনুকূল্য পেয়েছিলেন। পরে রঘুদেব ঘোষালের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তাঁর দৌহিত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়। এই রামহরি চট্টোপাধ্যায় হলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আদি পুরুষ। রায় বাহাদুর যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সরকারি আমলা। তাঁর চার পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র।

নৈহাটি কাঁঠালপাড়ার এই রথযাত্রা সেখানকার জনগণের মধ্যে এক আনন্দ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল। নয় দিন ধরে মেলা চলত। নানা ধরনের পসরা বসত। মাঠের মাঝখানে আটচালা ছিল, সেখানে প্রতিদিন যাত্রাপালা হতো। যদুভট্ট সেই সময় কাঁঠালপাড়ায় থাকতেন। তিনিও প্রতি সন্ধ্যায় আসর মাতিয়ে দিতেন। প্রথম দিকে মানুষের এই মেলায় আকর্ষণ না পেলেও পরবর্তীতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কাঁঠালপাড়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আটদিন গুঞ্জা বাড়িতে রাধাবল্লভ থাকেন। এই আটদিন আট প্রকার বেশ ধারণ করেন— রাজবেশ, গরুড়বাহন, কৃষ্ণকালী, কালীয়দমন, গোষ্ঠবিহার, বস্ত্রহরণ, নৌকাবিহার, সত্যভাষায় তুলাব্রত। এই মেলা ঘিরে অনেক ঘটনা জড়িয়ে আছে।

একবছর এই মেলায় একটি মেয়ে হারিয়ে যায়। বঙ্কিম জীবনীকার ও তাঁর ভাইপো সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায়, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অন্যান্যদের সঙ্গে মেয়েটিকে খুঁজতে বেরিয়ে পরেন। দুর্ভাগ্য যে, মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। মেলায় হারিয়ে যাওয়া মেয়েটিকে কেন্দ্র করে তার মাসদুয়েক পর রাধারাণী উপন্যাসটি লিখতে বসেন। তবে তাঁর উপন্যাসে তিনি রাধারাণীকে হারিয়ে যেতে দেননি। প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে মেলা পণ্ড হয়ে যাওয়ার পরও রাধারাণী ভাবছে দুর্যোগ কেটে গেলে আবার লোকজন ফিরে আসবে। তার মায়ের পথ্যের ব্যবস্থা করতে পারবে। তার হাতে গাঁথা মালাগুলি বিক্রি হবে। কিন্তু সন্ধ্যা থেকে রাত হয়ে গেল। দুর্যোগের বাড়ি ফিরতে ফিরতি পথ হারিয়ে ফেলেছিল। অবশেষে এক সহৃদয় ব্যক্তির সহায়তা লাভ করে। ১৮৭৫ সালে উপন্যাসটি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এই মেলাতেই একবার রথের চাকা থেমে গিয়েছিল। সেদিন ছিল রাধাবল্লভের পুনর্যাত্রা। উৎসবের শেষ দিন। বিকেলে অর্জুনা পুকুর থেকে যাত্রা শুরু হলো। কাঁসর, ঘণ্টা, জগঝম্প, ঢাক আর সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে রথ এগিয়ে চলেছে। হঠাৎই খবর আসে রথ থামিয়ে দিতে হবে। সবাই তো হতবাক। উপস্থিত কর্তাব্যক্তিরা পিতা যাদব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করলেন এর কারণ কী? তিনি হেসে বললেন, আমার বঙ্কিমের আদেশ। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বারাসতের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তার আদেশ কে অমান্য করবে? জানা গেল রথের ৯টি চাকার মধ্যে একটি চাকা বেঁকে গেছে আরও দুটি বেঁকে যাচ্ছে। উৎসবের আনন্দে কারোর সেদিকে নজর ছিল না। এই অবস্থায় রথ চললে দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।

দাদার মৃত্যুর পর রথের বেশিরভাগ খরচ বঙ্কিমচন্দ্রই বহন করতেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই কাঁঠালপাড়ার রথের মেলায় এসেছিলেন। আজও এই মেলা বসে। তিথি নক্ষত্র দেখে রথের রশিতে টান পড়ে। পুরাতন ঐতিহ্য বজায় রয়েছে। তবে সময়ের সঙ্গে কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। □

রথযাত্রা—দেশে ও বিদেশে

শুভদীপ পাল

ভারতীয় উৎসবের ইতিহাসে রথযাত্রা এমন এক অনন্য অধ্যায়, যেখানে আধ্যাত্মিকতা, স্থাপত্য, ইতিহাস, সমাজ সংস্কৃতি এবং জনঅংশগ্রহণ একসূত্রে গাঁথা। এটি একটি হিন্দু ধর্মীয় উৎসব নয়; বরং ভারতীয় সভ্যতার সেই দীর্ঘস্থায়ী ধারণার বহিঃপ্রকাশ, যেখানে ঈশ্বর মানুষের নাগালের মধ্যে, জনসমাজের অংশ হয়ে ওঠেন। প্রতি বছর আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়ায় শুরু হওয়া এই উৎসব মূলত ভগবান জগন্নাথ, ভ্রাতা বলভদ্র ও ভগিনী সুভদ্রার বার্ষিক রথারোহণ ও শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়।

রথযাত্রার মূল কেন্দ্র ওড়িশার পুরীধাম। ঐতিহাসিকদের মতে, জগন্নাথ উপাসনার সূত্রপাত বহু প্রাচীন উপজাতীয় দেব-আরাধনার মধ্যে নিহিত, যা পরবর্তীকালে বৈষ্ণব তত্ত্বের সঙ্গে একীভূত হয়। দ্বাদশ শতকে পূর্ব গঙ্গবংশের রাজা অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গদেব পুরীর বর্তমান জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ শুরু করেন। সেই সময় থেকেই রথযাত্রা একটি সুসংগঠিত রাজ-আয়োজিত উৎসব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। তবে পুরাণ ও লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, এই যাত্রা হলো জগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা মন্দিরে— যা তাঁর মাসির বাড়ি বলে পরিচিত— বার্ষিক গমন।

এই কাহিনির মধ্যে নিহিত আছে এক গভীর ধর্মতাত্ত্বিক বার্তা। সাধারণত দেবতা মন্দিরে অবস্থান করেন, যেখানে প্রবেশের নানা সামাজিক ও আচারগত সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে কিন্তু রথযাত্রায় দেবতা নিজেই বাইরে আসেন। এই কারণেই বহু গবেষক রথযাত্রাকে 'ritual of divine accessibility' বলে অভিহিত করেছেন। সমাজের সর্ব স্তরের মানুষ— জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে— রথের দড়িতে হাত লাগাতে পারেন।

পুরীর রথযাত্রা শুধু আধ্যাত্মিকতার জন্য নয়, তার স্থাপত্য ও নির্মাণশৈলীর জন্যও অসাধারণ। প্রতি বছর নির্দিষ্ট বনাঞ্চল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে নতুন করে তিনটি রথ নির্মিত হয়। জগন্নাথের নন্দীঘোষ প্রায় ৪৫ ফুট উঁচু এবং ১৬টি চাকা বিশিষ্ট; বলভদ্রের তালধ্বজ ১৪টি চাকার; আর সুভদ্রার দর্পদলন ১২ চাকার। প্রতিটি রথের রং, উচ্চতা, অলঙ্করণ, এমনকী কাঠের প্রকারও শাস্ত্রনির্ধারিত। কয়েকশো কারিগর ও শিল্পী অক্ষয় তৃতীয়ার

লাস এঞ্জেলস

মস্কো

দিন থেকে এই কাজ শুরু করেন। এই বার্ষিক পুনর্নির্মাণ ভারতীয় আচার-স্থাপত্যের এক বিরল উদাহরণ, যেখানে ক্ষণস্থায়িত্বই ঐতিহ্যের অংশ।

রথযাত্রার আরেকটি ঐতিহাসিক ও সামাজিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হলো ছেঁড়া পহড়া। গজপতি রাজা নিজে সোনার ঝাঁটা দিয়ে পথ পরিষ্কার করেন। মধ্যযুগীয় রাজতান্ত্রিক সমাজে এই আচার ছিল রাজশক্তির ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণের প্রতীক। এখানেই রথযাত্রা ক্ষমতার বদলে ভক্তির সমতার কথা বলে।

পুরীর বাইরে পশ্চিমবঙ্গে রথযাত্রার ইতিহাসও অত্যন্ত প্রাচীন। হুগলীর মাহেশ রথযাত্রার সূচনা ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দে বলে ধরা হয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম রথোৎসব। জনশ্রুতি অনুযায়ী, বৈষ্ণব সাধক কমলাকর পিপলাই এই উৎসব শুরু করেন। পরে ঊনবিংশ শতকে শ্রীরামপুরের দানবীর কৃষ্ণরাম বসু বিশাল কাঠের রথ নির্মাণে সাহায্য করেন। মাহেশের রথ শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, বঙ্গীয় নবজাগরণের সময় এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্রেও পরিণত হয়েছিল।

গুজরাটের আহমেদাবাদ রথযাত্রা তুলনামূলকভাবে নতুন, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শুরু হলেও বর্তমানে এটি পশ্চিম ভারতের বৃহত্তম রথযাত্রাগুলির একটি। পুরীর আদলে এখানে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার রথ বের হয়। তবে এর বৈশিষ্ট্য হলো সুসজ্জিত হাতি, সাধুদের আখড়া এবং রাজকীয় সামরিক শোভাযাত্রার অংশগ্রহণ। গুজরাটে এই উৎসব স্থানীয় হিন্দু জনজীবনের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংহতির প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের পৌরাণিক রাজধানী দ্বারকায় রথযাত্রাকে কৃষ্ণভক্তির বিশেষ আবহে উদ্‌যাপন করা হয়। যদিও এটি পুরীর মতো প্রভু জগন্নাথকেন্দ্রিক নয়, তবু শ্রীকৃষ্ণ ও জগন্নাথের ঐতিহাসিক সম্পর্কের সূত্রে এই উৎসব বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ুর কুম্ভকোনম এবং আঝওয়ার তিরুনাগরি অঞ্চলের 'থের' উৎসব রথযাত্রারই প্রাচীন দক্ষিণী রূপ। দক্ষিণ ভারতের মন্দির স্থাপত্যে এই বিশাল রথ বা 'থের'-কেন্দ্রিক নগর পরিকল্পনার ঐতিহ্য বহু শতাব্দী পুরোনো। এখানে রথের কাঠখোদাই ও ব্রোঞ্জমূর্তি অলঙ্করণ ভারতীয় কারুশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুরের কাং উৎসব রথযাত্রার একটি ভিন্ন অভিযোজন। অষ্টাদশ শতকে মণিপুরে বৈষ্ণব মত বিস্তারের পর এই উৎসব জনপ্রিয় হয়। এখানে স্থানীয় মেইতেই সংস্কৃতি ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ঐতিহ্যের মেলবন্ধন রথযাত্রাকে এক ভিন্ন রূপ প্রদান করে।

রথযাত্রার আন্তর্জাতিক বিস্তার শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। ১৯৬৭ সালে এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সানফ্রান্সিসকোতে প্রথম রথযাত্রার আয়োজন করেন। সেটিই ছিল আধুনিক বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক জগন্নাথ রথযাত্রা। এরপর International Society for Krishna Consciousness (ISKCON)-এর মাধ্যমে এই উৎসব দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

আজ নিউ ইয়র্কের ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউ থেকে লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ার, টরেন্টোর ডাউনটাউন থেকে মস্কোর শহরকেন্দ্র--- সবখানেই রথযাত্রা নিয়মিত আয়োজিত হয়। নিউ ইয়র্কের বৈশিষ্ট্য হলো শুধু ভারতীয় নয়, স্থানীয় আমেরিকানরাও এই উৎসবে যুক্ত হন। লন্ডনের রথযাত্রা ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ঔপনিবেশিক আমলে পুরীর রথযাত্রা দেখেই ইংরেজি ভাষায় 'juggernaut' শব্দের জন্ম, যা জগন্নাথ নাম থেকেই উদ্ভূত।

রাশিয়ার মস্কোতে রথযাত্রা এক নতুন আধ্যাত্মিক আকুলতার প্রতীক। সোভিয়েত যুগের নাস্তিক শাসনব্যবস্থার পতনের পর ভারতীয় ভক্তি আন্দোলনের প্রতি রুশ সমাজের আকর্ষণ বেড়েছে। জাপানের কাওয়াসাকি শহরে রথযাত্রা আবার প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক নগরজীবনের মাঝে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের উপস্থিতি মনে করিয়ে দেয়।

ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে বাংলাদেশের ধামরাই রথযাত্রা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় কয়েকশো বছরের পুরোনো এই উৎসব বঙ্গভূমির অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। একসময় ধামরাইয়ের বিশাল রথ সমগ্র বঙ্গে বিখ্যাত ছিল।

আজকের দিনে রথযাত্রা আর শুধু একটি আঞ্চলিক উৎসব নয়; এটি এক বিশ্বজনীন সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আন্দোলন। পুরীর বড়দণ্ড থেকে লন্ডনের রাজপথ, মাহেশের মেলা থেকে নিউ ইয়র্কের নগরসভ্যতা— সবখানেই এই উৎসবের মূল বার্তা এক— ঈশ্বর দূরের নন, তিনি মানুষের মধ্যেই, মানুষের পাশে।

সম্ভবত এই কারণেই রথযাত্রা হাজার বছর পেরিয়েও আজও প্রাসঙ্গিক। সময় বদলেছে, ভূগোল বদলেছে, ভাষা বদলেছে— কিন্তু রথের দড়িতে মানুষের হাত রাখার আকাঙ্ক্ষা বদলায়নি। সেই টানই রথযাত্রাকে এক চলমান ইতিহাসে পরিণত করেছে— যেখানে দেশ ও বিদেশ মিলেমিশে একাকার। □

বাঙ্গালির অনুপ্রেরণা বিশ্বজিৎ

দেবাশীষ চক্রবর্তী ॥ থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে বাঙ্গালি সমাজের গর্ব হিসেবে নিজেকে তুলে ধরলেন কোচবিহারের শিক্ষাবিদ বিশ্বজিৎ ঝা। সম্প্রতি ব্যাংককের মহিদুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয় মহিলাদের বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে নিজের গবেষণাপত্র ও বক্তব্য উপস্থাপন করেন তিনি।

বিশ্বজিৎ ঝার সঙ্গে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গুয়াহাটির ডেপুটি রেজিস্ট্রার ড. অভিজিৎ চৌধুরী এবং মালয়েশিয়ার বাঙ্গালি মহিলা উদ্যোক্তা স্বপ্না দাস। তিনজনেই ভারতীয় বাঙ্গালি হিন্দু ঐতিহ্যবাহী পোশাকে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করে সমবেত জনতার নজর কেড়েছেন।

এই আন্তর্জাতিক শিক্ষা সেমিনারে অংশ নেওয়া বিশ্বজিৎ ঝা'র এটি দ্বিতীয় বিদেশ সফর। এর আগে গত বছর মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে মালয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুধর্ম বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে বক্তব্য রাখেন তিনি।

শিক্ষা জগতের পরিচিত মুখ বিশ্বজিৎ ঝা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপ্রেরণামূলক সেশন পরিচালনা করে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করে আসছেন। ইতিমধ্যেই ইংরেজিতে লেখা তাঁর দুটি বই সারা ভারতে সমাদৃত হয়েছে। তিনি টেড টকস ও জোশ টকস-এর মঞ্চেও বক্তব্য রেখেছেন।

উল্লেখ্য, এক সময় দিল্লিতে জি-নিউজের বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে কর্মরত ছিলেন বিশ্বজিৎ। ২০১৩ সালে চাকরি ছেড়ে উত্তরবঙ্গে ফিরে আসেন এবং অবহেলিত শিশুদের জন্য কাজ করার উদ্দেশ্যে মেন্দাবাড়িতে একটি নিঃশুল্ক জনজাতি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। জলাপইগুড়ির মেন্দাবাড়ি গ্রামে পিছিয়ে পড়া শিশুদের গুণগত শিক্ষার আলো দেখানো পাশাপাশি তাদের শারীরিক বিকাশের জন্য তিনি 'বুক দাদা' (Book Dada) নামেও পরিচিত। তাঁর লিখিত বইয়ের মধ্যে 'বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা', 'মডার্ন বুদ্ধ' উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, 'গ্রামের ছেলে-মেয়েদের প্রচুর ট্যালেন্ট। তারা যেন অবহেলার শিকার না হয়, তাই আমার এই প্রচেষ্টা।' তাঁর সহধর্মিণী সংযুক্তা ঝা তার কাজের প্রধান সহযোগী। অভূতপূর্ব কীর্তি হিসেবে, বিশ্বজিৎ ঝা একমাত্র ভারতীয় যিনি চীনের রাজধানী বেজিঙে পুরোহিত হিসেবে দুর্গাপূজা সম্পন্ন করেছেন। বঙ্গ সংস্কৃতির পরিচিত মুখ হিসেবে বিশ্বমঞ্চে বাঙ্গালির গৌরব বাড়িয়ে চলেছেন বিশ্বজিৎ।

অভিভাবকদের প্রতি বিশ্বজিৎ ঝা'র কতক প্রেরণাদায়ী কথা হলো— (১) বেশির ভাগ সময়ে বাচ্চার হাতে মায়েরাই মোবাইল ফোন তুলে দেন যখন বাচ্চা ঠিকমতো খেতে চায় না। এটাই কিন্তু পরে বাচ্চাদের মোবাইল আসক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(২) কম বয়সে বাচ্চাদের ভালো-মন্দ বোধ গড়ে ওঠে না। তাই কম বয়সে ছোটোদের বাইক কিনে দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।

(৩) বাবা-মায়ের নিকট অনুরোধ, সন্তানকে ১২ ক্লাস পাশ করার আগে স্মার্ট ফোন কিনে দেবেন না।

(৪) মোবাইল আসক্তি কাটাতে বাচ্চাদের খেলাধুলা অথবা সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহী করে তুলুন।

(৫) সন্তানকে স্বার্থপরতার শিক্ষা দিলে তারা সেই শিক্ষা একদিন আপনার বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করবে।

যোগ শিক্ষিকা

আমি রেবা মুখার্জী। আমি একজন

যোগাসনের শিক্ষিকা। এখন আমার বয়স ৮৫ বছর। এখনো আমি প্রতিদিন দুই কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে যাতায়াত করি। এটা আমার বয়সি কারও পক্ষে ভাবাই যায় না।

গত ৪০ বছর ধরে আমি যোগাসন শিখিয়ে চলেছি। আমার দ্বারা অনেকেই উপকৃত হয়েছেন। তারা সকলেই শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন।

আমার এই যাত্রাপথ যে সুগম ছিল তা নয়। পেরোতে হয়েছে অনেক সমস্যা। নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছি। যোগাসন শুরুর প্রথমদিকেই আমি অনেক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে অনেক পুরস্কার পেয়েছি। সেসময় আশেপাশের মহিলারা আমার কৃতিত্বে প্রশংসা না করে আমার পোশাক ও ব্যাজ নিয়ে কটাক্ষ করেছে। তারা বলেছে, কী হবে এসব করে? মেয়ে হয়ে ব্যায়াম করে কুস্তি লড়বে নাকি? কোনো প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতে ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করতো, কীরে কী রকম পোশাক পরে মঞ্চে উঠেছিলিস?

এত নেতিবাচক কথা শোনার পরও আমি থেমে যাইনি। লক্ষ্য পূরণের জন্য আরও দৃঢ় হয়েছি। ত্রিশ বছর বয়স থেকে শুরু করা এই যাত্রাপথে আমি

এগোতে লাগলাম। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে আমার যোগাসনের শিক্ষিকা আলপনা দাসের সাহচর্যে বসিরহাট রবীন্দ্র সদনে যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান পেলাম প্রথম ছ'জনের মধ্যে। এরপর সেখান থেকে রাজ্যস্তরে সুযোগ পাই।

বারাসতে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে হরিয়াণায় জাতীয় স্তরে যোগাসন প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হই। এটিই ছিল আমার জীবনের প্রথম জাতীয় স্তরে যোগাসন প্রদর্শন। প্রথমবারে প্রতিযোগিতায় স্থান দখল না করতে পারলেও তার পরের বছর দিল্লিতে জাতীয় স্তরে পুনরায় অংশগ্রহণ করে স্বর্ণপদক লাভ করি।

এরপর আমাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বিভিন্ন জায়গা থেকে পেয়েছি আমন্ত্রণ। হরিদ্বার থেকে পেয়েছি বাবা রামদেবজীর আমন্ত্রণ। তামিলনাড়ু থেকে পেয়েছি জয়ললিতাজীর আমন্ত্রণ। লাভ করেছি প্রচুর পদক। ২০২৫ সালে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে আমি আমার শেষ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি এবং প্রথম স্থান লাভ করি।

দীর্ঘ ৪৬ বছরের যোগাসন চর্চার জীবনে আমাকে সহ্য করতে হয়েছে নানা কটাক্ষ। কিন্তু আনন্দ এটাই যে, যারা একদিন আমাকে নিরুৎসাহিত করেছিল আজ তারাই আমার দ্বারস্থ হয়েছে যোগাসন শেখার জন্য। সুস্থ থাকার জন্য তারা ছুটে যাচ্ছে বিভিন্ন যোগ অনুশীলন কেন্দ্রে।

শ্রীমতী রেবা মুখার্জী, টাকি রোড, বারাসত, দঃ ২৪ পরগনা।

জাতীয় উদ্যান

নর্থ বাটন আইল্যান্ড

নর্থ বাটন আইল্যান্ড জাতীয় উদ্যান উত্তর ও মধ্য আন্দামান জেলায় অবস্থিত। ১৯৮৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মোট আয়তন ০.৪৪ বর্গকিলোমিটার। এই উদ্যানে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ, পাখি ও বন্যপ্রাণী রয়েছে। উদ্যানটি বঙ্গোপসাগরের নীল জলে ঘেরা। উদ্যানটি চিতল হরিণের জন্য বিখ্যাত। জলজ টিকিটিকি ও গুইসাপের মতো সরীসৃপ এখানে অনেক সংখ্যায় রয়েছে। এছাড়া নীল তিমি, সামুদ্রিক কচ্ছপ, ডুগন, ডলফিন ও সুন্দর সুন্দর মাছ দেখা যায়। শীতকালে বড়ো বড়ো তিমি জলের উপরিভাগে উঠে আসে। এই উদ্যান পরিদর্শনের সেরা সময় নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস।

পোর্ট ব্লেয়ার বা লং আইল্যান্ড থেকে সরকার পরিচালিত ফেরি বা ভাড়া করা চার্টার বোটের মাধ্যমে উদ্যানে যাতায়াত করা যায়।

এসো সংস্কৃত শিখি-১১৯

ভবিষ্যত কাল: – (ভাগ : ১)

(ভবিষ্যৎ কাল– পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে একই)

বালক: গমিষ্যতি – বালক যাবে।
বালিকা গমিষ্যতি – বালিকা যাবে।
ভবান গমিষ্যতি –আপনি যাবেন (পুং)
ভবতি গমিষ্যতি –আপনি যাবেন (স্ত্রী)
স: গমিষ্যতি – সে যাবে (পুং)
সা গমিষ্যতি – সে যাবে (স্ত্রী)
এষ: গমিষ্যতি –ইনি যাবেন (পুং)
এষা গমিষ্যতি –ইনি যাবেন (স্ত্রী)
ক: গমিষ্যতি –কে যাবে (পুং)
কা গমিষ্যতি –কে যাবে (স্ত্রী)

এরকম পুংলিঙ্গে **স:, এষ:, ক: ভবান** এবং স্ত্রীলিঙ্গে **সা, এষা, কা, ভবতী** দিয়ে বাক্য রচনা করতে হবে। যেমন **গমিষ্যতি** দিয়ে বাক্য রচনা করা আছে, সেরকম ভাবে।

ভালো কথা

কোকিল ছানা

সেদিন বাসা থেকে পড়ে যাওয়া একটা কোকিল ছানা বাবা বাড়িতে নিয়ে এসেছে। মা বাবার উপর রেগে গিয়ে বলছিল, ওটাকে খাওয়াবে কী? মরে গেলে তোমার পাপ হবে যে। কেউ কাছে গেলেই ছানাটি লাল টুকটুকে মুখ হাঁ করে চিঁ চিঁ করছিল। একটু পরেই দেখি, দুটো কাক ঠোঁটে খাবার নিয়ে এসে ছানাটিকে খাইয়ে দিচ্ছে। বাবা তখন মাকে ডেকে বলল, দেখো, ওদের খাওয়ানোর চিন্তা দূর হয়ে গেল। মা বলল, উড়তে শিখলে ওটাকে ছেড়ে দিও।

নবনীতা ঘোষ, পঞ্চমশ্রেণী, মহদীপুর, গৌড়, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) হা তু স্য ক
(২) বি বা সু দী

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) বি বি বে চা চ র না
(২) ক ল মূ বি ন দ নো

২২ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) প্রজাপালন (২) প্রক্রিয়াজাত

২২ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) মদনমোহন (২) বিষয়সম্পত্তি

(১) বর্ণিনী সরকার, ই বি, মালদা। (২) কৃত্তিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, মালদা।
(৩) পূজা সরদার, ক্যানিং, দ: ২৪ পরগনা। (৪) সুমিত সরকার, রায়গঞ্জ, দ: দিনাজপুর

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®

EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book & Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে

SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

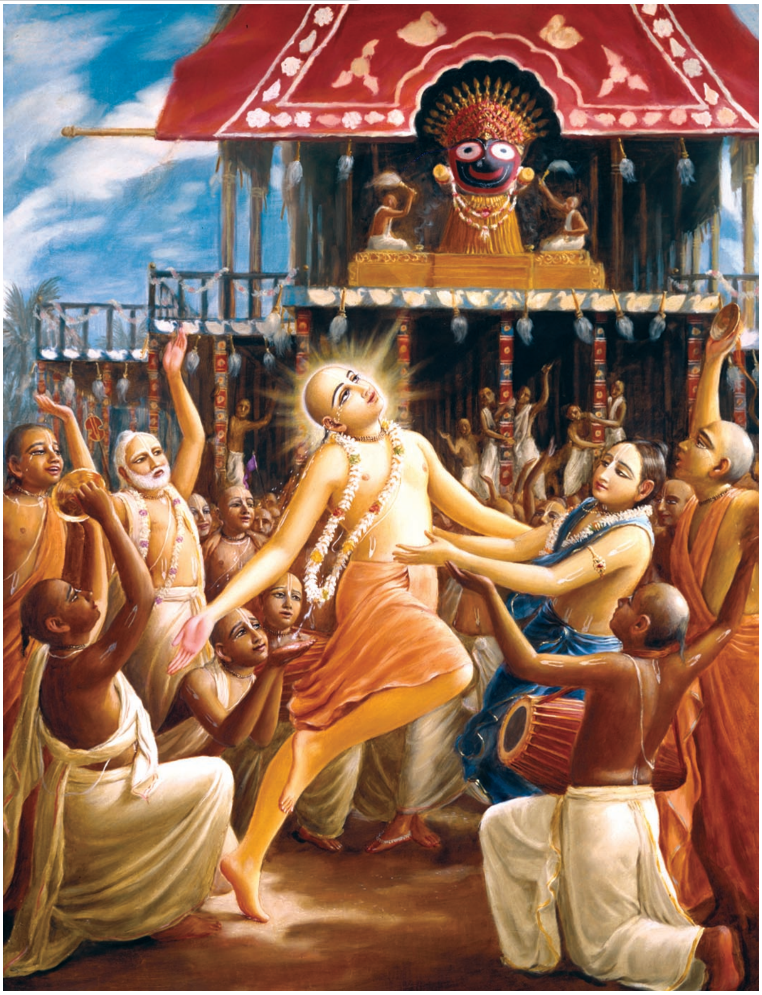

যারা রথের রশি ধরে টানছিল তারা বুঝল যে তাদের শক্তিতে রথ চলে না, রথ চলে আপন শক্তিতে। তখন সকলে আনন্দে চিৎকার করে প্রভুর জয় ঘোষণা করতে লাগলেন। রাজা শ্রীপ্রভুর একটি নামকরণ করেছিলেন 'প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা'। অতএব জয় প্রতাপ রুদ্র সংত্রাতার জয়। জয় প্রতাপরুদ্রের জয়। প্রভুর শক্তিতে মুহূর্তের মধ্যে রথ গুণ্ডিচায় গিয়ে পৌঁছাল। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা আপন আপন সিংহাসনে বসলেন।

শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

গোপাল চক্রবর্তী

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য চললেন ওড়িশায়, উদ্দেশ্য নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন। ওড়িশা গমনের পথে নৌকার মাঝিদের বড়ো উৎপাত ছিল। প্রভু সমুদ্রপথে গঙ্গাসাগর, সুন্দরবন প্রভৃতি পার হয়ে ওড়িশায় পৌঁছালেন। প্রভু ওড়িশায় অন্যকে কি ভবসাগর পার করবেন, প্রথমে গিয়েই মাঝি দানীর সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাঁধল। তাঁরা দু'জন পার হবেন তার দান চাই। কিন্তু কারও কাছে কপর্দকমাত্র নেই। মাঝিই-বা বিনা কড়িতে কেন পার করবে? সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র থাকলে কেড়ে নিত। তাও ছিল না। প্রভু সমেত দু'জন ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালে দানী দান চাইল। তাঁরা বললেন— কপর্দক মাত্র নেই। পার করো, তোমার পুণ্য হবে। কিন্তু পুণ্যের লোভ দানীর নেই। তার অর্থ চাই। প্রভু আর তার সহযাত্রীরা যখন বললেন— তাঁদের কাছে কপর্দকমাত্র নেই। তখন দানী বলল— তবে ওদিকে যাও, এদিকে এসো না।

একথা বলে দানী শ্রীচৈতন্যের দিকে তাকাতে আর চোখ ফেরাতে পারল না। বলল— ঠাকুর তুমি এসো, আর তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরও নিয়ে এসো।

দানীর কথা শুনে লীলাময় শ্রীচৈতন্য বললেন— দানী, ত্রিজগতে আমার কেউ নেই, আমিও কারও না।

শ্রীচৈতন্য চাইলে সবাইকে নিয়ে পার হতে পারতেন। তিনি তা করলেন না। দানীর কথামতো ঘাটে গিয়ে বসলেন। ঘাটে বসেই তিনি দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে রোদন করতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন— হে জগন্নাথ, আমাকে দর্শন দাও।

শ্রীচৈতন্যের এরূপ কাণ্ড দেখে ভক্তরা হেসে উঠলেন। আবার ভাবতে লাগলেন— প্রভু একটা কথা বললেই তো দানী সবাইকে পার করে দিত, কিন্তু প্রভু তা করলেন না। তবে কি সঙ্গীদের ছেড়ে প্রভুর একা যাওয়ার ইচ্ছা? ওপারে চলে গেলে আরতো প্রভুর সন্ধান পাওয়া যাবে না। নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্ত যখন এসব চিন্তা করছেন তখন ওদিকে শ্রীচৈতন্য 'হে জগন্নাথ দেখা দাও, দেখা দাও' বলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করছেন। প্রভুর সকাতর প্রার্থনা উচ্চৈঃস্বরে রোদন আর অশ্রুধারা দেখে দানী বিস্মিত হলো। সে এই দিব্য কান্তি, রহস্যময় পুরুষের পরিচয় জানতে উদ্গ্রীব হলো। সঙ্গীরা এঁর পরিচয় জানে এই বিশ্বাসে সে অগ্রসর হয়ে নিত্যানন্দকে তাঁদের এই সঙ্গীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করল।

ফ ঃ ৬

তখন নিত্যানন্দ বললেন--- ইনি ভগবানের অবতার। স্বয়ং ভগবান নবদ্বীপে মানবদেহ ধারণ করেছেন। এখন সন্ন্যাসী হয়ে পাপীতাপীদের উদ্ধার করছেন। এবার চলেছেন নীলাচলে। আমরা প্রভুর সেবক, রক্ষক।

এই কথা বলে নিত্যানন্দ-সহ সবাই কেঁদে উঠলেন। দানীও সেই সঙ্গে কাঁদতে লাগল। এবার সবাইকে যত্ন করে ঘাটে নিয়ে গেল। দানী তখন প্রভুর চরণে পড়ে বলল, কোটি জন্মের পুণ্যফলে আজ তোমার চরণ দর্শন করলাম।

তখনই দানীর সব বন্ধন মোচন হলো, আর সকলে হরি হরি বলে প্রভু-সহ নৌকায় উঠে পার হলেন।

* * *

সঙ্গীদের নিয়ে শ্রীচৈতন্য চলেছেন জগন্নাথ দর্শনে। পথে কপোতেশ্বর। এই তীর্থ দর্শন করে আবার পথচলা। কমলপুর ছেড়েই প্রভু মন্দিরের চূড়া দেখতে পেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন— ও কী?

ভক্তরা বললেন। —শ্রীমন্দিরের চূড়া।

দূর থেকে শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখে প্রভু স্তম্ভিত হলেন। প্রভুর মন তখন দাস্যভাবে শ্রীজগন্নাথে নিবিষ্ট হয়েছে। জগন্নাথভাবে আপ্লুত শ্রীচৈতন্য দেখছেন যেন বালক বনমালী প্রাসাদাগ্রে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে তাঁকে আহ্বান করছেন। যেন বলছেন— এই দেখ তুমি যেমন আমাতে মিলতে ব্যস্ত, আমিও তেমনি তোমার অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। এই অপার্থিব দৃশ্য দেখে মহাপ্রভু ভাববিহ্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর কণ্ঠথেকে এক অপূর্ব শ্লোক বেরিয়ে এল, প্রাসাদাগ্রে...। শ্লোক শেষ হলো না প্রভু মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। সম্পূর্ণ শ্লোকটি জগৎবাসী কোনোদিন জানতে পারল না। কিন্তু প্রভু বেশিক্ষণ মূর্চ্ছিত থাকতে পারলেন না। আনন্দধারায় হৃদয় উত্তাল হলো। অল্প চেতনা পেয়েই তিনি শ্রীমন্দিরের দিকে ছুটলেন। আর চিৎকার করে বলছেন ওই দেখ তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। কী সুন্দর নীলকান্তমণি, কী সুন্দর বদন। কী সুন্দর হাসি। বলতে বলতে আবার মূর্চ্ছিত হলেন। এইভাবে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা, ক্ষণে ক্ষণে জাগরণে প্রভু মন্দিরের দিকে চলেছেন। ক্রমে আঠারো নালা পেরিয়ে প্রভু সঙ্গীদের সঙ্গে পুরীতে প্রবেশ করলেন।

এই সময়ে প্রভুর স্মরণ হলো তার হাতে দণ্ড নেই। তিনি নিত্যানন্দের কাছে দণ্ড চাইলেন। প্রভু যখন কপোতেশ্বর দর্শনে গিয়েছিলেন তখন নিত্যানন্দ সে দণ্ড তিন খণ্ড করে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এখন প্রভুকে বোঝালেন যে প্রভু মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন তাঁকে ধরতে গিয়ে নিত্যানন্দ ও প্রভু দুজনেই সেই দণ্ডের উপর পড়ে যান তাতে দণ্ড ত্রিখণ্ডিত হয়ে যায়। সেই ত্রিখণ্ডিত দণ্ড তিনি জলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছেন।

নিত্যানন্দ বললেন— আমার দোষেই তোমার দণ্ড ভঙ্গ হয়েছে তাই তুমি আমার দণ্ড বিধান কর।

প্রভু বললেন--- তোমরা আমায় নীলাচলে এনেছ, সবাইকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু তোমরা আমার একমাত্র সম্পদ দণ্ডটি রক্ষণ করতে পারনি, তাই আমি প্রভু জগন্নাথের দর্শনে তোমাদের সঙ্গে যাবো না। হয় তোমরা আগে যাও অথবা আমি আগে যাবো।

ভক্ত মুকুন্দ দত্ত বললেন— প্রভু, তুমি আগে দর্শন কর। আমরা পশ্চাতে যাবো। তোমার সঙ্গে যাবো না।

এই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য একাকী অতি দ্রুত মন্দির অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রকৃত কথা, প্রভুর ইচ্ছা তিনি একা মন্দিরে প্রবেশ করবেন। একা জগন্নাথ দর্শন করবেন। তাই দণ্ড ভাঙ্গার ছল করে ক্রোধ করলেন, আর ক্রোধ উপলক্ষ্য করে ভক্তদের পেছনে রেখে একা শ্রীমন্দির অভিমুখে তিরের ন্যায় ছুটলেন। দূর থেকে জগন্নাথদেবকে দেখে প্রভু প্রেমে অস্থির হয়ে গেলেন। পড়িদারা (জগন্নাথদেবের সেবক) কিছু বোঝার আগেই শ্রীচৈতন্য মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর বাসনা জগন্নাথদেবকে একবার কোলে করা কিন্তু জগন্নাথকে স্পর্শ করেই প্রভু আবার মূর্চ্ছিত হলেন। পড়িদারা ছুটে এসে যষ্টি দ্বারা প্রভুকে প্রহার করতে উদ্যত হলে দৈবক্রমে সেখানে উপস্থিত হলেন সার্বভৌম। শ্রীচৈতন্যের সৌন্দর্য আর প্রেমের বিকার দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি পড়িদাদের নিষেধ করলেন শ্রীচৈতন্যকে প্রহার করতে। এদিকে তখন জগন্নাথদেবের ভোগের সময় আসন্ন। ভোগ নিবেদনের সময় শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে কেউ থাকতে পারে না। এই নবীন সন্ন্যাসী এখনও মূর্চ্ছিত, তাঁকে এখানে রেখে গেলে ভোগ নিবেদনে বিঘ্ন ঘটবে। তাই সার্বভৌম তাঁকে আপন গৃহে নিয়ে যাবার সংকল্প করলেন। বিশাল দেহ সন্ন্যাসীর, তাঁকে বহন করতে কয়েকজন বলিষ্ঠ লোকের প্রয়োজন। সার্বভৌম সেই সেবকদের মধ্যে যারা তাঁর শিষ্য তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে অনুরোধ করলেন এই সন্ন্যাসীকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিতে। তারা সানন্দে হরিনাম করতে করতে শ্রীচৈতন্যকে সার্বভৌমের গৃহে পৌঁছে দিলেন। সার্বভৌম তাঁকে পবিত্রস্থানে উত্তম শয্যায় শয়ন করালেন। বাহকদের বিদায় দিয়ে সন্ন্যাসীর শিয়রে বসে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর আয়ত নয়ন অর্ধমুদিত, তারা স্থির। হৃদয়ের স্পন্দন অনুভূত না হলেও শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়া চলছে। তাঁর অঙ্গ পুলকাবৃত দেখে বুঝলেন যে, সন্ন্যাসী মহাভাবে বিভোর হয়ে আছেন। সার্বভৌম যত দেখছেন সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তবে অনেকক্ষণ হয়ে গেল তার চৈতন্য ফিরছে না দেখে চিন্তিত রয়েছেন।

এদিকে নিত্যানন্দ প্রমুখ গৌরভক্ত শ্রীমন্দিরে এসে সমস্ত বিবরণ শুনলেন যে, অজ্ঞান অবস্থায় প্রভুকে সার্বভৌম তাঁর গৃহে নিয়ে গেছেন। তাঁরা তখন কী করবেন তা ভেবে আকুল। ঠিক এই সময়ে গোপীনাথের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। গোপীনাথ বাঙ্গালি, তাঁদের পূর্ব পরিচিত এবং তিনি সার্বভৌমের ভগ্নীপতি। সমস্ত ঘটনা অবগত হয়ে গোপীনাথ এই ভক্তদের নিয়ে সার্বভৌমের গৃহে গেলেন। ভক্তরা প্রভুর সম্বন্ধে এত চিন্তান্বিত ছিলেন যে, শ্রীমন্দিরে এসে জগন্নাথদেবকে দর্শন করতেও ভুলে গেলেন। সার্বভৌমের গৃহে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ প্রমুখর সমবেত হরিনামে প্রভুর চৈতন্য ফিরে আসে 'হরি-হরি-হরি' বলে তিনি উঠে বসলেন। সার্বভৌম প্রভুকে 'নমো নারায়ণায়' বলে প্রণাম করে পদধূলি গ্রহণ করলেন। প্রভুও 'কৃষ্ণে মতিরস্তু' বলে আশীর্বাদ করলেন। সার্বভৌমের কাতর প্রার্থনায় প্রভু সঙ্গীদের

নিয়ে সমুদ্রস্নান সেরে সার্বভৌমের গৃহে জগন্নাথের প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

কিছুদিন শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করলেন শ্রীচৈতন্য। নিত্য জগন্নাথ দর্শন, সমুদ্রস্নান ভক্তেরা কখনো কখনো মাধুকরীতে বের হন। ততদিনে প্রভু পুরীতে পরিচিত হয়ে গেছেন। তিনি অনুভব করলেন, সার্বভৌমের চিত্তদর্পণ বিদ্যার অহংকারে মলিন হয়েছে। সার্বভৌমকে কৃপা করে প্রভু তাঁর পাণ্ডিত্যাভিমান হরণ করলেন। যখন তাঁর পাণ্ডিত্যাভিমান গেল তিনি দিব্যচক্ষু পেলেন। সার্বভৌম মানসচক্ষে প্রভুকে ষড়ভুজমূর্তিতে যেরূপ দর্শন করেছিলেন তা তিনি শ্রীমন্দিরে এবং নিজের বাসগৃহে অঙ্কিত করে রেখেছিলেন।

উৎকলদেশে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মিলন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। নৃসিংহদেব দর্শনের পর গোদাবরী তীরে প্রভুর সঙ্গে রায়রামানন্দের সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দর্শনেই রামানন্দ প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং প্রভু তাঁকে উদ্ধার করেন।

* * *

একদা সার্বভৌমকে ডেকে পাঠালেন রাজা প্রতাপরুদ্র। ওড়িশায় তখন ভয়ানক দুর্দিন। মুসলমানরা চারদিক থেকে কটক নগরও ঘিরে ফেলেছেন। এই অবস্থায় রাজার বার্তা পেয়ে সার্বভৌম ভয়ে ভয়ে উপস্থিত হলেন কটকের রাজপ্রাসাদে। রাজা তাঁকে দেখে বললেন— ভট্টাচার্য! শুনলাম এক মহাশয় নাকি নীলাচলে আগমন করেছেন। তিনি নাকি প্রবল প্রতাপান্বিত। অনেকে তাঁকে স্বয়ং জগন্নাথ বলে বিশ্বাস করে। তিনি নাকি জগন্নাথ বলে বিশ্বাস করে। তিনি নাকি তোমাকে বড়ো কৃপা করেছেন। আমি তাঁর সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।

সার্বভৌম বললেন--- মহারাজ যা শুনেছেন সবই ঠিক। তিনি মহাশয় তাই আমাকে কাঙ্গাল দেখে দুষ্টমন শোধন করার চেষ্টা করেছেন। রাজা বললেন— বটে। তুমি একবার আমাকে তাঁর দর্শন করাও।

সার্বভৌম বললেন— মহারাজ তিনি সন্ন্যাসী। নির্জনে ভজন করেন। রাজ দর্শন সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। তিনি কখনো ধর্ম নষ্ট করবেন না।

রাজা বললেন— সেকি তোমরা সকলে উদ্ধার পাবে। আর আমি রাজা বলে উদ্ধার পাবনা?

সার্বভৌম বললেন--- প্রভুর সঙ্গে আপনার মিলন ঘটাতে আমি সর্বদা সচেষ্ট থাকব।

* * *

হরিদাস ছিলেন দৈন্যের আদর্শ। আর দৈন্য দেখলেই প্রভু চিরকালই আনন্দিত হয়ে থাকেন, তাই নিজমুখে শ্লোকে বলেছেন— 'যে তৃণ হইতেও নীচ হইতে পারে, সেই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের উপযুক্ত। শ্রীক্ষেত্রে আছেন হরিদাস, আশ্রয়হীন। প্রভু কাশী মিশ্রকে বললেন--- আমার বাসার নিকটস্থ পুষ্পোদ্যানে তোমার একখানি ঘর আছে ওটি আমায় ভিক্ষা দাও।

কাশী মিশ্র সানন্দে রাজি হলেন। তখন প্রভু হরিদাসের সন্ধানে বেরুলেন। বেশ কিছু দূরে তাঁকে দেখতে পেলেন। হরিদাস তখন রাজপথে নামকীর্তন করছেন। প্রভুকে দেখে হরিদাস চরণে দণ্ডবত করলেন। প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করবেন বুঝতে পেরে করজোড়ে পিছু হটছেন আর বলছেন— প্রভু আমাকে ছোঁবেন না। আমি অস্পৃশ্য পামর। আপনার যোগ্য নই।

প্রভু তখন গদগদ ভাবে বলছেন— আমি পবিত্র হবার জন্য তোমাকে স্পর্শ করতে বাঞ্ছা করি। হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষাধিক জপ করতেন। তা লক্ষ্য করে প্রভু শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক পড়লেন—

অহোবত শ্বপচোহতো গরীয়ান্
সজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সম্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।

প্রভু তখন হরিদাসকে হৃদয়ে ধরে ভক্তগণ-সহ আনন্দে রোদন করতে লাগলেন। পরে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে গিয়ে বললেন— এই তোমার ঘর, এখানে বাস করবে ও নামকীর্তন করবে। আমি প্রত্যহ এসে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। তোমার জন্য প্রত্যহ মহাপ্রসাদ আসবে। মন্দিরের চক্র দেখে প্রণাম করবে। কথিত, ভক্ত হরিদাসের প্রচণ্ড রৌদ্র তাপে কষ্ট হয় এইজন্য প্রভু তার আখড়ার সামনে একটি বকুল ডাল শ্রীহস্তে রোপণ করেছিলেন। সেই ডাল মহীরুহ হয়ে অদ্যাবধি হরিদাস আখড়ার সামনে বিদ্যমান। যবন হরিদাসের উদ্দেশে প্রভু একটি কালজয়ী শ্লোক রচনা করেছিলেন। 'কূল জ্যাত্যানপেক্ষায় হরিদাসয়ে তে নমঃ।'

* * *

রথযাত্রার আগের দিন শেষ রাত্রে প্রভু ভক্তদের নিয়ে শয্যাত্যাগ করে স্নান সমাপনান্তে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হলেন। শুরু হলো রথযাত্রার প্রথম পর্ব 'পহণ্ডি-বিজয়'। শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও দেবী সুভদ্রাকে ধরাধরি করে শ্রীমন্দির থেকে রথের উপর নিয়ে যাওয়াকে পহণ্ডি বিজয় বলে। রাস্তায় কিছু দূরে দূরে পাতা থাকে তুলার গদি, দয়িতারা শ্রীবিগ্রহ নিয়ে তুলি বা তুলার গদির উপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। রাজা প্রতাপরুদ্র সুবর্ণ মার্জনা দিয়ে পথ-সম্মার্জন করে চন্দনজল ছিটিয়ে দিচ্ছেন। দীন ভাবে রাজার এই সেবাকার্য দেখে রাজা প্রভুর কৃপাভাজন হলেন। সেই সেবা দেখে প্রভু অশেষ সুখ পেলেন। রথের আকৃতি যেমন বিশাল তেমনি তার সাজসজ্জাও অপরূপ। অন্যান্যবার রথের যে সজ্জা হতো এবার রাজার আজ্ঞায় তার থেকে অধিক সজ্জা দেওয়া হয়েছে। বোধহচ্ছে রথ যেন সুবর্ণমণ্ডিত নানা বর্ণের বস্ত্র দ্বারা সুশোভিত। তিনটি সুসজ্জিত বিশাল রথ--- জগন্নাথদেবের রথ 'নন্দীঘোষ', বলরামের রথ 'তালধ্বজ' এবং সুভদ্রার 'দর্পদলন'।

নানা বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত। দয়িতারা (জগন্নাথদেবের সেবক পাণ্ডা) একে একে জগন্নাথ, বলরাম ও দেবী সুভদ্রার বিগ্রহ রথে স্থাপন করে। প্রভুর বলে বলীয়ান গৌড়ীয়রা উৎকলবাসীদের অধিকারচ্যুত করে রথের রশি ধরে টানতে লাগলেন। প্রভু আপনজনদের মধ্যে চারটি কীর্তন সম্প্রদায় তৈরি করে কীর্তন শুরু করলেন। কীর্তন শুরু হলে অন্যান্য বাদ্য থেমে গেল। রথ চলতে লাগল গুণ্ডিচা মন্দিরের দিকে। রথ চলছে। চার দলের কীর্তনও চলছে। প্রভু মাঝে মাঝে 'মণিসা'

(সর্বেশ্বর, ওড়িয়া) বলে উচ্চনাদ করছেন। প্রভু তখন একদল ছেড়ে অন্যদলে বিচরণ করছেন। কিংবা তাঁর অনুভবনীয় শক্তির দ্বারা সকল দলে এক সময়ে বিরাজ করছেন।

রাজা দেখছেন শ্রীজগন্নাথ যেন রথ থামিয়ে প্রভুর কীর্তন শুনছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর জ্ঞান হলো যে, রথের উপর যিনি বসে আছেন তিনি আর প্রভু এক। তিনি দেখলেন রথের উপর জগন্নাথের স্থানে প্রভু বসে আছেন।

চারদলে নয়জন কীর্তন বিশারদের নেতৃত্বে নামগান হচ্ছে। প্রভু নৃত্য করছেন। কখনো-বা জ্ঞান হারাচ্ছেন। একবার জ্ঞান হারালে রাজা তাঁকে স্পর্শ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। তিনি বললেন— ছিঃ, একি হলো? আমার বিষয়ীর স্পর্শ হলো।

একথা বলে রাজার হস্ত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তিনি অন্যদিকে চলে গেলেন। গীতবাদ্য সহকারে তিনটি রথ এগিয়ে চলেছে গুণ্ডিচা মন্দিরের দিকে। প্রভু আবার জ্ঞান হারালেন। এবার রাজা তাঁকে তোলার চেষ্টা না করে পদসেবা করতে লাগলেন। প্রভুর মূর্চ্ছা সহসা ভাঙলো না। প্রভু বলছেন তিনি রাজসম্ভাষণ করবেন না। রাজারও সংকল্প তিনি প্রভুর কৃপাপাত্র হবেন। শেষপর্যন্ত ভগবান ভক্তের কাছে পরাস্ত হলেন। এবার প্রভু বিষয়ীর স্পর্শে সঙ্গে সঙ্গে চেতনা লাভ করলেন না। রাজার যত্নে ধীরে ধীরে সচেতন হলেন। আবার চলা, মহারাজ সখাগণ-সহ প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসেন। প্রভু পিণ্ডায় উপবেশন করলে রাজার প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল। সার্বভৌম, রামানন্দের পরামর্শে রাজা রাজবেশ ত্যাগ করে বৈষ্ণবের বেশে একা প্রভুর সামনে উপস্থিত হলেন। ভাবলেন— 'যদি অপরাধ করি তবে শ্রীভগবানের পাদস্পর্শে সমুদয় অশুভ ক্ষয় হয়ে যাবে। অতএব ভগবানের শ্রীপাদস্পর্শে কখনো কোনো বিপদ নেই' এটি শ্রীভগবতের কথা। একথা ভেবে প্রভুর পদতলে বসে স্বহস্তে প্রভুর পদসেবা করতে লাগলেন। রামানন্দের পরামর্শ অনুযায়ী পদসেবা করতে করতে রাজা রাসের গোপীগীতার প্রথম শ্লোকটি পাঠ করলেন—

'জয়তি তেঽধিকং জান্মানা ব্রজশ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়তি দৃশ্যতাং দিক্ষু তারকাস্থয়ি ধৃতাসবস্তাং বিচিন্বিতে।।'

প্রভুর মনের ভাব বাইরে ব্যক্ত হতো। কারণ তাঁর হৃদয় কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ ও সরল। এই শ্লোক শোনামাত্র প্রভুর প্রফুল্লবদন অধিকতর প্রফুল্ল হলো। তখন রাজা পরম আশ্বাসিত হয়ে পদসেবা করতে করতে দ্বিতীয় শ্লোক পাঠ করলেন। প্রভুর আনন্দতরঙ্গ আরও বেড়ে উঠল। যদিও নয়ন উন্মিলন করলেন না কিন্তু মুখে নিতান্ত হর্ষ প্রকাশ করে বললেন— বল বল তারপর গোপিনীরা কী বলল বল। প্রভু এই প্রথম রাজার সঙ্গে কথা বললেন। রাজার আনন্দে কণ্ঠরোধ হয়ে যাচ্ছে। তবুও পড়লেন—

'বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য তে চরণমীযুষাং সংসৃতৈভয়াৎ,
করসরোরুহং কান্ত কমিদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম।।'

এইভাবে একের পর এক শ্লোক প্রভুকে শুনিয়ে যাচ্ছেন রাজা। প্রভু বার বার উঠতে চাইছেন কিন্তু পারছেন না। রাজা বুঝলেন শ্লোক শোনার জন্য প্রভু উদ্গ্রীব। রাজা আবার পড়লেন—

'তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।।'

প্রভু আর থাকতে পারলেন না হুংকার দিয়ে উঠলেন 'ভুরিদা' 'ভুরিদা' বলে অর্থাৎ তুমি আমাকে অনেক দান করলে। প্রভু তখন হাত বাড়িয়ে রাজাকে বললেন— কে তুমি পরম সুহৃদ অকস্মাৎ কৃষ্ণলীলামৃত পান করিয়ে আমার তৃষিত হৃদয় শীতল করলে। তুমি আমাকে বহু দান দিয়েছ, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, আমার দেওয়ার মতো কিছুই নেই, এস তোমাকে আলিঙ্গন দান করি। এই বলে রাজাকে হৃদয়ে ধারণ করে 'তবকথামৃত' শ্লোক পড়তে পড়তে একে অপরের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়লেন। প্রভুর শক্তি রাজার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হলো। তার ফলে রাজার শরীরে পুলক প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হলো। রাজা যতখানি শক্তি ধারণ করতে পারেন ততখানি পেলেন। তখন প্রভু সম্পূর্ণ চেতনা পেয়ে রথে জগন্নাথ দর্শনে ছুটলেন।

নারিকেল-শাসন বনের ভোগকার্য সম্পূর্ণ হলে গৌড়ীয়রা আবার রথের রশি ধরে টানতে গেলেন কিন্তু রথ আর চলে না। তখন তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা করলেন তবুও চলে না। রাজা সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন। প্রথমে বড়ো বড়ো মল্লদের রথ টানতে নিযুক্ত করলেন। পরে বড়ো বড়ো হাতি এনে রথের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে রথ টানবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু রথ অচল। অথচ মসৃণ পরিষ্কার পথ। রাজা নিশ্চিত যে জগন্নাথদেব তাঁর উপর কোনো কারণে ক্রুদ্ধ হয়েছেন। উপায়ান্তর না দেখে রাজা প্রভুর শরণ নিলেন। প্রভুও ইঙ্গিতে আশ্বাস দিয়ে রথের দিকে অগ্রসর হলেন। প্রভুর ভক্তরাও তাঁর অনুগমন করলেন। প্রভু প্রথমে হস্তীগুলিকে ছাড়িয়ে রথের রশি আপনজনদের হাতে দিলেন। আর নিজে রথের পশ্চাতে গিয়ে মস্তকস্পর্শ করে রথ ঠেলতে লাগলেন। রথ অমনি গড়গড় করে চলতে লাগল।

যারা রথের রশি ধরে টানছিল তারা বুঝল যে তাদের শক্তিতে রথ চলে না, রথ চলে আপন শক্তিতে। তখন সকলে আনন্দে চিৎকার করে প্রভুর জয় ঘোষণা করতে লাগলেন। রাজা শ্রীপ্রভুর একটি নামকরণ করেছিলেন 'প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা'। অতএব জয় প্রতাপ রুদ্র সংত্রাতার জয়। জয় প্রতাপরুদ্রের জয়। প্রভুর শক্তিতে মুহূর্তের মধ্যে রথ গুণ্ডিচায় গিয়ে পৌঁছাল। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা আপন আপন সিংহাসনে বসলেন।

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

লাঞ্ছিত বিবেকানন্দ

সৈকত নিয়োগী

‘স্বামী বিবেকানন্দ’— একটা নাম, যাকে নিয়ে আজ ভারত গর্ব করে। একটা মুখ, যাকে আজ কোটি কোটি মানুষ শ্রদ্ধা করে। একটা কণ্ঠ, যা শিকাগোর মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষকে নতুন মর্যাদা দিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো— এই মানুষটাকেই কি তাঁর নিজের রাজ্যে, নিজের দেশে, নিজের সমাজে সবচেয়ে বেশি অপমান সহ্য করতে হয়নি? শুধু জীবদ্দশায় নয়, মৃত্যুর পরেও? হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন। স্বামী বিবেকানন্দ মারা যাওয়ার পরেও তাঁকে ছিঁড়ে খেয়েছে সমালোচনা, কুৎসা, বিদ্বেষ, হিংসা আর চরিত্রহননের নোংরা রাজনীতি। এমনকী একটা কাগজ তাঁর মৃত্যুর পর লিখেছিল— ‘The meat-eating Swami of Belur is dead.’

ভাবুন একবার! যে মানুষটা ভারতীয় আত্মাকে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দিলেন, যিনি ধর্ম, মানবতা, জাতীয়তাবোধ, আত্মবিশ্বাস— সবকিছুকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেলেন, তাঁর মৃত্যুতে একাংশের প্রথম প্রতিক্রিয়া কী— ‘মাংস খাওয়া স্বামীজী মারা গেছে।’ এত ঘৃণা? এত বিদ্বেষ? কেন? আজ পর্যালোচনার সময় এসেছে যে, কীভাবে শিকাগো থেকে দক্ষিণেশ্বর, কাশী থেকে কলকাতা, ব্রাহ্ম সমাজ থেকে রাজনৈতিক দল, দেশি-বিদেশি সংবাদপত্র থেকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক— সব জায়গায় তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছে। আর সেই আক্রমণের ভিতরে লুকিয়ে ছিল— হিংসা, জাতপাতের অহংকার, সংকীর্ণতা, বাঙ্গালির আত্মঘাতী ঈর্ষা আর একজন অসাধারণ মানুষকে নিজের মাপে ছোটো করে ফেলার মরিয়া চেষ্টা।

স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে প্রথম বড়ো আকারের আক্রমণ শুরু হয়েছিল শিকাগো ধর্মমহাসভার পর। শিকাগোয় যা ঘটেছিল, তা শুধু সাফল্য নয়— একটা বিস্ফোরণ। একজন অচেনা ভারতীয় সন্ন্যাসী, গেরুয়া পোশাকে, পশ্চিমি সভ্যতার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে এমনভাবে কথা বললেন যে, আমেরিকা তাঁকে মাথায় তুলে নিল। হল ভরে গেল। মানুষ মুগ্ধ। সংবাদপত্র উত্তেজিত। শিকাগোর মঞ্চে তিনি শুধু বক্তৃতা দেননি; ভারতের আত্মসম্মানকেও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু সবাই কি সেটা গ্রহণ করতে পেরেছিল? না। সেদিন সবাই হাততালি দেয়নি। কেউ কেউ ভিতরে ভিতরে জ্বলে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম নাম— প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ব্রাহ্মসমাজের এই বিশিষ্ট নেতা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে জানতেন, নরেন্দ্রনাথকে ছাত্রজীবন থেকেই চিনতেন। কিন্তু তিনি কল্পনাও করেননি যে, সেই নরেন একদিন শিকাগোয় এমন ঝড় তুলবেন। যে জনপ্রিয়তা তিনি নিজে পাননি, সেই জনপ্রিয়তা বিবেকানন্দের হাতে চলে যাওয়া— এটা তিনি মেনে নিতে পারেননি। স্বামীজী নিজেই চিঠিতে লিখেছিলেন— ‘সেবার ছিল মজুমদারের পালা, এবার আমার। আমি কী করতে পারি?’ এই একটা বাক্যেই যেন সবটা ধরা আছে। সমস্যা ছিল না ধর্মে। সমস্যা ছিল না মতাদর্শে। সমস্যা ছিল— কে পাদপ্রদীপের আলোয় থাকবে। তারপর শুরু হলো কুৎসা। শুধু স্বামীজীকে নয়, তাঁর মাকেও ছাড়া হলো না। মিথ্যে রটনা, অপপ্রচার, ব্যক্তিগত আক্রমণ— সব চলল। কিন্তু বেশিদিন তা টেকেনি। কারণ যারা স্বামীজীর কাছে গিয়েছিলেন, তাঁকে কাছ থেকে দেখেছিলেন, তাঁরা বুঝেছিলেন যে, এই মানুষটার বিরুদ্ধে যা বলা হচ্ছে, তার বেশিরভাগই মিথ্যে, বিদ্বেষ আর হিংসা থেকে ছড়ানো নোংরা অপপ্রচার।

পরিব্রাজক স্বামীজীকে যাঁরা গভীর শ্রদ্ধা করতেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রমদাদাস মিত্র। কাশীর এই বেদান্তপণ্ডিত স্বামীজীকে অনেক দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর এই প্রমদাদাস মিত্রও স্বামীজীর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন। অভিযোগ কী?— স্বামীজী শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছেন; ‘কালাপানি’ পার হয়ে কী কী অভক্ষ্য-কুখাদ্য খেয়েছেন, কে জানে! তিনি নাকি ‘নিজে নিজেই’ সন্ন্যাস নিয়েছেন; উপরন্তু, তিনি কায়স্থ সন্তান, তাঁর সন্ন্যাসের অধিকারই নেই!

> ‘স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝতে হলে শুধু তাঁর বক্তৃতা নয়, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা প্রতিটা কুৎসাও পড়তে হবে। কারণ, একজন মানুষ কত বড়ো, তা বোঝা যায় অনেক সময় তাঁর ভক্তদের দেখে নয়, তাঁর শত্রুদের দেখে।’

একজন সাধক যাঁকে শ্রদ্ধা করেন, যাঁকে পথপ্রদর্শক মানেন, সেই মানুষটাই যদি একদিন তাঁকে বলেন— ‘তোমার সন্ন্যাসের অধিকার নেই।’ তাহলে কেমন লাগে? স্বামীজী এই আঘাতে ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলেন। এক ধরনের তীব্র হতাশা নিয়ে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন— ‘‘মুখে সবাই বলে ‘সবই ব্রহ্মের প্রকাশ’, কিন্তু মনে মনে তারা সব মানুষকে মেনে নিতে পারে না। এই কথার মধ্যে কী ভয়ঙ্কর সত্য লুকিয়ে আছে জানেন? আমরা বেদান্তের কথা বলি, সর্বজনীনতার কথা বলি, কিন্তু বাস্তবে? বাস্তবে আমরা মানুষকে

মাপি; জাত দিয়ে, খাদ্য দিয়ে, জন্ম দিয়ে, সামাজিক পরিচয় দিয়ে।" আর স্বামী বিবেকানন্দের অপরাধ কী ছিল? তিনি সেই ভণ্ডামিকে সরাসরি আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

'দক্ষিণেশ্বর'। এই নামটা শুধু একটা মন্দিরের নাম নয়। এটা স্বামীজীর জীবনের এক মহাগুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এখানেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে গড়ে তুলেছেন। এখানেই নরেনের ভিতরে তৈরি হয়েছে সেই আগুন, যা পরে বিশ্বকে আলো দেখাবে। বিদেশ থেকে ফিরে উপযুক্ত তিথি বুঝে শ্রীশ্রীঠাকুরের কক্ষ দর্শনের জন্য স্বামীজী দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন। একটু থাকলেন, তারপর চলে এলেন। সাধারণ একজন ভক্তের মতোই গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর যা হলো, তা অপমানের ইতিহাসে লেখা থাকার মতো। মথুরবাবুর পরিবারের ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস স্টেটসম্যান-এ বিজ্ঞাপন দিয়ে জানালেন— 'আমরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানাইনি। তিনি নিজেই এসেছিলেন, নিজেই চলে গেছেন।' অর্থাৎ কী বোঝানো হলো? যেন তিনি অনধিকারচর্চা করেছেন। যেন তাঁর সেখানে যাওয়াই বেমানান।

এরপর এমন পরিস্থিতি তৈরি হলো যে, স্বামী বিবেকানন্দের দক্ষিণেশ্বরে প্রবেশই বন্ধ হয়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবও আর সেখানে উদ্‌যাপিত হতো না; অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। অকল্পনীয় ছিল সেই অপমান! যে মানুষটার জীবন গঠনের এক কেন্দ্র দক্ষিণেশ্বর, যিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরাধিকার বহন করছেন, তাকেই সেই পরিসর থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হলো। আজ দক্ষিণেশ্বরে তাঁর মূর্তি বসেছে; কিন্তু সেটাও যেন একটা দেরিতে করা পাপস্খলন। কারণ ইতিহাস জানে— তাঁকে সেখানে সম্মান দেওয়া হয়নি, তাঁকে সেখানে অপমান করা হয়েছিল।

একদল মানুষ সারাক্ষণ বোঝাতে চাইত— স্বামী বিবেকানন্দ নাকি বিদেশে গিয়েছেন বিলাসিতা করতে, নাম করতে, আরামে থাকতে। কিন্তু তিনি ১৮৯৫ সালে হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখছেন— 'আমি এখানে মজা বা ফুর্তি করতে আসিনি। এসেছি ভারতবর্ষের কথা প্রচার করতে।' এই একটা বাক্যই যথেষ্ট। নিজের শরীর শেষ করে, অসুস্থতা নিয়ে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে ছুটে বেড়াচ্ছেন স্বামীজী কার বা কাদের জন্য? ভারতের কথা বলার জন্য। ভারতীয় দর্শনের কথা বলার জন্য। ভারতীয় মানুষের মর্যাদার কথা বলার জন্য। কিন্তু এদেশে তাঁর সম্পর্কে কী প্রশ্ন করা হচ্ছে? 'ওই দেশে এতদিন ছিলেন, কী খেতেন?' 'মাংস খেতেন?' 'কালাপানি পেরিয়ে কী কী করলেন?' অর্থাৎ তাঁর কাজ নয়, তাঁর বার্তা নয়, তাঁর সংগ্রাম নয়; মানুষের আগ্রহ তাঁর খাবারের থালায় কী ছিল সেটা নিয়ে!

স্বামীজীর বিরুদ্ধে সমালোচনার একটা বড় কারণ ছিল— জাতপাত। তিনি নিজেই রসিকতা করে লিখেছিলেন— 'বিশেষত কায়স্থকুলে পয়দা হওয়ায় আমি এখন চুরির দায়ে ধরা পড়েছি।' তিনি ব্রাহ্মণ নন। কায়স্থের ছেলে সন্ন্যাসী হবে? শাস্ত্র বলবে? দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে? বিদেশে গিয়ে হিন্দুধর্মের মুখ হয়ে দাঁড়াবে? তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের অনেকেই এটা সহ্য করতে পারেনি। এমনকী বেলুড় মঠে তিনি স্নান করতে যাচ্ছেন, আর ব্রাহ্মণরা কটাক্ষ করছেন। এই ঘটনাগুলো শুধু ব্যক্তিগত অপমান নয়, এগুলো দেখিয়ে দেয়— স্বামী বিবেকানন্দ যে ভারতকে বদলাতে চেয়েছিলেন, সেই ভারত তখন ভেতরে ভেতরে কতটা কুপ্রথাচ্ছন্ন ছিল।

কেন এত আক্রমণ? একজন সমাজ-সংস্কারককে কেন এত বিদ্বেষ? কেন এত মানুষ তাঁকে টেনে নামাতে চাইত? এই প্রশ্নের একটা নির্মম উত্তর রয়েছে— যারা তথাকথিত বাঙ্গালি, তারা অনেক সময় অন্যের সাফল্য যেন সহ্য করতে পারে না। এটা শুনতে খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে মানুষটা নিজের প্রতিভা, শ্রম, আত্মশক্তি আর বুদ্ধির জোরে উঠে দাঁড়ায়— অনেকে তাকে আগে সন্দেহ করে, তারপর কুৎসা করে, তারপর অপমান করে, তারপর যখন বিশ্ব তাকে স্বীকৃতি দেয়, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নেয়। স্বামীজীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। শিকাগো তাঁকে মাথায় তুলেছে। পশ্চিমি সংবাদপত্র লিখছে— 'তিনি মানববাকশক্তির এক মহিমময় রূপ।' কেউ তাঁকে বলছে— 'Our man'। একজন আমেরিকান সাহিত্যিক লিখছেন— 'Columbus discovered the soil of America– and Vivekananda discovered its soul.'— এত বড়ো সম্মান! এত বিরাট গ্রহণযোগ্যতা! কিন্তু বাঙ্গালির একাংশের চোখে, তিনি শুধু সন্দেহের পাত্র, সমালোচনার পাত্র, বিদ্রূপের লক্ষ্য। কারণ, এই সাফল্যটা তাদের পক্ষে হজম করা কঠিন ছিল। স্বামীজী বলেছিলেন— 'আমি ইয়াঙ্কিদের ভালোবাসি।' এই একটা লাইন নিয়ে কত কী কাণ্ড করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে একটা রাজনৈতিক দল তাঁকে 'গুড়গুড়ে' বলতে শুরু করল। তাদের বক্তব্য— স্বামীজী নাকি আমেরিকান বুর্জোয়াদের সমর্থক! কিন্তু প্রশ্ন হলো— তারা কি গোটা প্রসঙ্গ পড়েছিল? তারা কি বুঝেছিল, কোন অর্থে তিনি এই কথা বলছেন? না, তারা বিষয়টা বোঝেনি। স্বামীজী 'ইয়াঙ্কিদের ভালোবাসি' বলেছিলেন কারণ তিনি দেখেছিলেন— আমেরিকানদের মধ্যে নতুন জিনিস গ্রহণ করার একটা অসাধারণ মানসিকতা আছে। একটা openness রয়েছে। তিনি তাদের সেই মানসিকতার প্রশংসা করেছিলেন। তিনি আমেরিকার সবকিছুর দাসত্ব করেননি। বরং যেখানে সমালোচনা করার, সেখানেও তীব্র সমালোচনা করেছেন। আসলে সমস্যা হলো— অনেকে কনটেক্সট পড়েন না। একটা লাইন তুলে নেন, তারপর তাকে নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধামতো ব্যবহার করেন। তারপর বলেন--- 'বিবেকানন্দ তো contradictory!' আসলে contradictory ছিলেন না স্বামীজী। বাঙ্গালিদের একাংশ অলস পাঠক। অর্ধশিক্ষিত পাঠক। তারা প্রসঙ্গ কেটে মানুষকে বিচার করতে ভালোবাসে।

অনেকেই হয়তো ভাবেন, স্বামীজী শুধু নিজের দেশেই আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন, মোটেও তা নয়। বিদেশেও তাঁকে রেহাই দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়বার বিদেশে যাওয়ার সময় ইংল্যান্ডে অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। কেউ বলেছিল— 'Prophet-এর কখনও diabetes হয় না!' এটা কী ধরনের আক্রমণ? একজন মানুষের অসুস্থতাকে টেনে এনে তাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদাকে খাটো করার চেষ্টা। অর্থাৎ, যদি তুমি মহান হও, তবে তুমি অসুস্থ হবে না! এমন অবৈজ্ঞানিক, শিশুসুলভ, নিষ্ঠুর যুক্তিও তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। আবার কেউ লিখছে— স্বামীজীর সভায় যে হাততালি পড়ে, সেটা নাকি পুরুষদের নয়, চুড়িপরা হাতের হাততালি! এদেশের একটা কাগজ তো আরও নীচে নেমে লিখেছিল; তিনি বিবেকানন্দ নন, 'বিবি কা আনন্দ'। এটা শুধু কটাক্ষ নয়। এটা পৌরুষ একজন সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্য ও বৈরাগ্য নিয়ে বিদ্রূপ, চরিত্রহনন, ব্যক্তিত্বকে ভাঙার চেষ্টা। অর্থাৎ তাঁকে ছোটো করতে হলে, তাঁকে নারীসঙ্গ, নারীপ্রশংসা, নারীসম্পর্ক— এসবের সঙ্গে জুড়ে দাও। কারণ সমাজ জানে, চরিত্রে কাদা ছুঁড়লে মানুষ খুব তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করে নেয়।

বেলুড় মঠে যখন ইউরোপীয়, আমেরিকান ভক্তরা আসতেন, থাকতেন, বেদান্ত দর্শন শিখতেন— তখনই শুরু হয়েছিল আরেক দফা কুৎসা। বিশেষ করে বিদেশি মহিলাদের সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্ক নিয়ে। যেন একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে একজন শিক্ষিতা নারী, একজন শিষ্যা, একজন

সহযোদ্ধা, একজন সহকর্মীর কোনো সম্পর্কই হতে পারে না; অবশ্যই সেখানে 'অবৈধতা' খুঁজে বের করতে হবে! ভগিনী নিবেদিতা— যিনি নিজের জীবন ভারতকে দিয়েছেন, রোগ-শোক, দারিদ্র্য, প্রতিকূলতা, জলবায়ু— সবকিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কাজ করেছেন, মেয়েদের জন্য স্কুল গড়েছেন; তাঁকেও রেহাই দেয়নি সমালোচকরা। তারা বলেছে, স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর নাকি অবৈধ সম্পর্ক ছিল। এই অভিযোগগুলো আসলে কী প্রমাণ করে? প্রথমত, অভিযোগকারীদের মানসিকতা। দ্বিতীয়ত, আমাদের সামাজিক অসুস্থতা। আমরা নারী-পুরুষের মধ্যে শ্রদ্ধা, আদর্শ, শিক্ষা, আধ্যাত্মিকতা, কর্মবন্ধন— এসব কল্পনাই করতে পারি না। আমরা ভাবি— যেখানে নারী আছে, সেখানে নিশ্চয়ই গোপন সম্পর্ক আছে। এটাই বাঙ্গালির একাংশের মনের অন্ধকার।

স্বামীজীর জীবনে এমন অনেক মানুষ ছিলেন, যারা একসময় তাঁর খুব কাছে এসেছিলেন, পরে সমালোচক হয়েছেন। মারি লুই, যিনি পরে স্বামী অভয়ানন্দ নামে পরিচিত হন— তিনিও স্বামীজীর সমালোচনা শুরু করেছিলেন। আবার হেনরিয়েটা মুলার স্বামীজীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তিনিও পরে ইংল্যান্ডে গিয়ে সমালোচনা শুরু করেন। কেন? কারণ অনেকেই ভেবেছিলেন— স্বামীজীকে তারা 'নিজেদের' করে রাখবেন। তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিলেন না। তিনি কারও খাঁচার পাখি ছিলেন না। তিনি নিজের মতো চলতেন, নিজের মতো ভাবতেন, নিজের মতো সিদ্ধান্ত নিতেন। আর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অসুখগুলোর একটা হলো— যাঁকে তুমি ভালোবাসো, তাঁকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাও। আর সে যদি নিয়ন্ত্রণে না আসে, তাঁকে আক্রমণ করো।

স্বামীজী চেয়েছিলেন সরলা দেবী চৌধুরানীকে দ্বিতীয়বার বিদেশে নিয়ে যেতে। কারণ তিনি চেয়েছিলেন পশ্চিমকে দেখাতে— ভারতের নারীরা কত শিক্ষিতা, কত শক্তিশালী, কত সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ। প্রথমে সরলা দেবী 'আশা' নামে একটা লেখা লিখলেন। সেখানে তিনি স্বামীজীর প্রশংসা করলেন। কিন্তু তারপর শর্ত জুড়ে দিলেন— ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা বন্ধ করতে হবে। তাহলেই সমর্থন। এখানেই সংঘর্ষ। স্বামীজী জবাবে এমন একটা চিঠি লিখলেন, যা আজও পড়লে বিদ্যুৎ চমকের মতো লাগে। তিনি মূলত বলেছিলেন— 'দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন হলে আমরা যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত। কিন্তু পূজা বন্ধ করলেই যদি আপনারা সমাজসেবায় নামেন, না হলে, না নামেন; তাহলে কাচের ঘরেই থাকুন, বাইরে আসার দরকার নেই।' এই উত্তর সরলা দেবীকে ভীষণভাবে আহত করল। তিনি লিখলেন 'নিরাশা'। সেখানে এমনও মন্তব্য করলেন— বেলুড় মঠের চূড়াগুলো ভেঙে পড়লেও দেশের কোনো ক্ষতি হবে না। এটা কিন্তু শুধু মতভেদ ছিল না— এটা ছিল ক্ষোভ, আহত অহং, প্রতিক্রিয়া। কিন্তু গল্প এখানেই শেষ নয়। পরে সরলা দেবী নিজেই মত পরিবর্তন করেছিলেন। নিজের লেখায় স্বীকার করেছিলেন— যাঁর এত সমালোচনা করেছিলেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জন্য বিদেশ থেকে খাবারদাবার এনেছেন, নিজে রান্না করে খাইয়েছেন। তিনি যখন মায়াবতীতে গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের জীবন কাছ থেকে দেখলেন; তিনি দেখলেন— চাল ঝাড়া থেকে অতিথি সামলানো, গীতাপাঠ থেকে নিত্যকর্ম, সব আছে, কিন্তু নেই সংসারী স্বার্থপরতা। আছে শুধু কর্তব্য। এই অভিজ্ঞতা তাঁর চোখ খুলে দেয়। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়।

এখানে একটা বড় শিক্ষা আছে; দূর থেকে বিচার করা সহজ কিন্তু কাছ থেকে দেখলে অনেক ভুল ভেঙে যায়।

স্বামী বিবেকানন্দকে ছোটো করতে গিয়ে এই তথাকথিত বাঙ্গালিরা আসলে কাকে ছোটো করেছে? নিজেদের। তারা তাঁকে বলেছে 'মাংসখেকো'। তাঁকে বলেছে 'ভণ্ড'। তাঁর সন্ন্যাস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাঁর জাত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাঁর খাদ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাঁর বিদেশযাত্রা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাঁর অসুস্থতা নিয়ে বিদ্রূপ করেছে। তাঁর সঙ্গে মহীয়সী নারীদের সম্পর্ক ছিল গুরু-শিষ্যা সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক নিয়ে তারা কাদা ছুঁড়েছে। তাঁর বক্তৃতার জনপ্রিয়তা পর্যন্ত খাটো করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হলো? ইতিহাস কাকে মনে রাখল? সমালোচকদের? কুৎসাকারীদের? অপবাদদাতাদের? না। ইতিহাস মনে রেখেছে— স্বামী বিবেকানন্দকে।

যারা তাঁকে আক্রমণ করেছিল, তাদের অধিকাংশের নাম আজ ইতিহাসে টিকে আছে শুধু এই পরিচয়ে যে, তারা স্বামীজীর সমালোচক ছিল। এই যে ঈর্ষা, এই যে মানুষকে টেনে নামানোর নেশা, এটা শুধু স্বামীজীর ক্ষেত্রে নয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া হয়নি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে কল্পনাতীত আক্রমণ করা হয়েছে। নোবেল পাওয়ার পরও তাঁকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর কার্মাটাঁরে চলে গিয়েছিলেন— মানুষের অকৃতজ্ঞতা আর কুৎসায় ক্লান্ত হয়ে। অর্থাৎ 'সমস্যা' কিন্তু একজন মানুষ নয়। 'সমস্যা' একটা সামাজিক মানসিকতা।

একবার ভেবে দেখা যাক যে কেন স্বামীজীকে এত আক্রমণ করা হয়েছে? কারণ তিনি শুধু সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি শুধু সুবক্তা ছিলেন না। তিনি শুধু দার্শনিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন একটা বিপদ। কার বা কাদের জন্য?— ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীদের জন্য। জাতপাতের অহংকারে ভরা সমাজের জন্য। আত্মতুষ্ট বুদ্ধিজীবীদের জন্য। সুবিধাবাদী নেতাদের জন্য। আর সেই মানসিকতার জন্য, যে মানসিকতা চায় যে মাথা নীচু করে বাঁচুক সাধারণ মানুষ।

স্বামীজী বলেছিলেন— নতুন ভারত বেরিয়ে আসুক চাষার কুটির থেকে। তিনি সাধারণ মানুষকে সম্মান দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন শক্তির কথা, আত্মমর্যাদার কথা, জেগে ওঠার কথা। তিনি চেয়েছিলেন ধর্ম হোক জীবনের শক্তি, দুর্বলতার অজুহাত নয়। এই মহামানবকে ভালোবাসা সহজ কাজ নয়। কারণ তাঁকে সত্যি করে ভালোবাসতে গেলে নিজেকেও বদলাতে হয়। আর আমরা কী করি? নিজেকে বদলাই না। বরং যে বদলে দিতে আসে, তাঁকেই অপমান করি। তাই আজ প্রশ্নটা স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে নয়। প্রশ্নটা আমাদের নিয়ে। আমরা কি সত্যিই তাঁকে পড়েছি? আমরা কি তাঁর কথা প্রসঙ্গ-সহ বুঝেছি? আমরা কি তাঁর সংগ্রাম, অপমান, নিঃসঙ্গতা, লাঞ্ছনা— এসবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি? নাকি আজও আমরা সেই পুরনো তথাকথিত বাঙ্গালি রোগে আক্রান্ত— যে এগিয়ে যায়, তাকে টেনে নামাও।

স্বামীজীকে থামানো যায়নি। সমালোচনা তাঁকে শেষ করতে পারেনি। কুৎসা তাঁকে মুছে দিতে পারেনি। অপমান তাঁকে ভাঙতে পারেনি। কারণ মানুষটা ব্যক্তি ছিলেন না, একটা শক্তি ছিলেন। একটা জাগরণ ছিলেন। একটা অগ্নিশিখা ছিলেন। আর ইতিহাসের নিয়ম খুব নির্মম! আগুনকে যারা কাদা ছুঁড়ে নেভাতে চায়, তাদের নাম কাদাতেই ডুবে যায়। আগুন রয়ে যায়। স্বামী বিবেকানন্দ রয়ে গেছেন। আর যারা তাঁকে টেনে নামাতে চেয়েছিল— তারা আজ ইতিহাসের ফুটনোট।

স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝতে হলে শুধু তাঁর বক্তৃতা নয়, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা প্রতিটা কুৎসাও পড়তে হবে। কারণ, একজন মানুষ কত বড়ো, তা বোঝা যায় অনেক সময় তাঁর ভক্তদের দেখে নয়, তাঁর শত্রুদের দেখে।

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৮৯)

নিয়তির ইচ্ছা ও সুভাষচন্দ্র বসু

একবার ডবল নিউমোনিয়ায় ডাক্তারজী গুরুতর অসুস্থ হয়ে দেওলালীতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানে দেশভক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর পক্ষ থেকে ডাক্তারজীর সাক্ষাতের সময় নির্ধারণের জন্য বালাজী হুদ্দার এবং তাঁর সঙ্গে বোম্বাইয়ের ডাঃ বসন্তরাও, রামারাও সপ্তাগিরিকে পাঠানো হয়েছিল। খুব অসুস্থ থাকলেও ডাক্তারজী তাদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন। যুদ্ধের পরিস্থিতির সুযোগে সুভাষচন্দ্র ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে চান। সব কথা শুনে ডাক্তারজী বলেছিলেন— 'এটা ঠিক যে পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে উঠেছে, কিন্তু বিপ্লবের জন্য আপনাদের প্রস্তুতি কী রকম? প্রথমে অন্তত ৫০ শতাংশ প্রস্তুতি অবশ্যই থাকা চাই। এদিক থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর কাছে কতজন এমন মানুষ আছেন'? নিজেদের প্রস্তুতি ব্যতীত স্বাধীনতার জন্য শুধু অন্যের উপর নির্ভর করে কাজ হবে না।'

পরবর্তীতে আরও আলোচনার জন্য ডাক্তারজী তাঁদের নাগপুরে আমন্ত্রণ জানান। ৮ থেকে ৯ জুলাইয়ের (১৯৩৯) এই ঘটনার পর ১৮ জুলাই নাগপুরে এ প্রসঙ্গে বালাজী হুদ্দারের কাছ থেকে ডাক্তারজী একটি পত্র পান। সুভাষচন্দ্র বসু 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠনের পরে তখন বোম্বাইয়ে অবস্থান করছেন। ২০ জুলাই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ডাক্তারজীকে অনেক অনুরোধ করেই লেখা হয়— 'বোম্বাইয়ে আসবেন যদি সম্ভব হয়'। কিন্তু ডাক্তারজীর শরীর তখন এতটা খারাপ যে, বোম্বাই যাওয়া তাঁর সাধ্যে কুলোয়নি। ঈশ্বরের ইচ্ছা বোধ হয় এমনই ছিল। শেষপর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বসু নিজেই একদিন এলেন ডাক্তারজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। কিন্তু ডাক্তারজী তখন মৃত্যুশয্যায়।

১৯ জুন রাতটি খুব সংকটে কেটেছে। রোগের প্রকোপে দু-চোখের পাতা এক করতে পারেননি। শরীর খুব দুর্বল। ২০ জুন সকালে ঘটাটেজীর বাংলোয় যেখানে ডাক্তারজী ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু ও রামভাউ রুইকরের গাড়ি এসে পৌঁছল। ঘটনাচক্রে ডাক্তারজী তখনই একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। সুভাষচন্দ্র বসু ফরোয়ার্ড ব্লকের অধিবেশনের জন্য ১৮ জুন নাগপুরে পৌঁছেছেন। ডাক্তারজীর অসুস্থতার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছেন। সুভাষচন্দ্র বসু ডাক্তারজীর ঘরে প্রবেশ করে তন্দ্রাচ্ছন্ন ডাক্তারজীর দিকে তাকালেন। কাছে থাকা স্বয়ংসেবক শ্রীকৃষ্ণ পুরাণিক ও যাদবরাও যোশীর কাছে ডাক্তারজীর অসুস্থতার সব খবরাখবর নিলেন— 'গত দশ পনেরো দিন যাবৎ জ্বর ১০৩-১০৪ ডিগ্রির নীচে নামছে না। তাঁর ঘুম হয় না, কিন্তু এখন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে দেখা যাচ্ছে। আপনার বিশেষ জরুরি প্রয়োজন থাকলে ডেকে দিই'। একথা শুনে সুভাষচন্দ্র বসু বললেন— 'বস্তুত, আমি জরুরি কাজেই এদিকে এসেছিলাম কিন্তু এই সময় ডাক্তারজীর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে শুধু তাকে দেখতে এসেছিলাম। পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবো।' এই বলে কিছুক্ষণ ডাক্তারজীর দিকে তাকিয়ে থেকে দু-হাত জোড় করে প্রণাম করলেন। তারপর বাইরে সামান্য সময় বসে কথাবার্তা বলে চলে গেলেন। তাঁর মোটরগাড়ি বাংলো ত্যাগ করতেই ডাক্তারজীর তন্দ্রা ভেঙে গেল। শুনে অস্থির হয়ে উঠলেন— 'সুভাষচন্দ্র বসু এলেন আর তাঁর অসময়ে তন্দ্রার জন্য দেখা হলো না। খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। কষ্ট পেলেন বোঝা গেল। সবাই বললো— 'তিনি আবার দেখা করতে আসবেন বলে গেলেন'। কিন্তু তা আর হলো কোথায়! সুভাষচন্দ্র বসু ডাক্তারজীকে দেখে গেলেন তাঁর শেষ মুহূর্তের চব্বিশ ঘণ্টা আগে মাত্র। মানা ছাড়া তো উপায় নেই যে, নিয়তির এটাই ইচ্ছা ছিল। *সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস*